বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

দেবী চৌধুরাণী

[১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ষষ্ঠ সংস্করণ হইতে]

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৪৯
তৃতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১
মূল্য এক টাকা চারি আনা

মুদ্রাক্রর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৬—২০।৫।১৯৪৪

ভূমিকা

[শ্রীযদুনাথ সরকার]

'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই আমাদের জানাইয়াছেন—"ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই।...দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ [অর্থাৎ 'আনন্দমঠে'র মত] একটু ঐতিহাসিক মূল আছে।... 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুড্‌ল্যাড্ সাহেব, লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্ এই নামগুলি ঐতিহাসিক।...দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।"

এ কথা সত্য। নাম ও তারিখ ধরিয়া দেখিতে গেলে এই উপন্যাসে ইতিহাসকে মানিয়া চলা হয় নাই। প্রকৃত ভবানী পাঠক এক জন ভোজপুরী অর্থাৎ আরা জেলার বিহারী ব্রাহ্মণ। তাহার সহযোগী এবং ততোধিক বড় ডাকাতের সর্দ্দার মজ্‌নুন্ সাহ, মেওয়াতী অর্থাৎ বর্ত্তমান আলোয়ার রাজ্যের লোক; বাঙ্গলায় তাহার জন্ম হয় নাই, এবং মৃত্যুর পর তাহার দেহ বাঙ্গলা হইতে সেই সুদূর মেওয়াতে কবর দিবার জন্য পাঠান হয়, বাঙ্গলার হেয় জমিতে নহে। তাহাদের অনুচরগণ রাজপুত, কেহই বাঙ্গালী নহে—"Not a Bengal(i) rable, but a number of well-armed Rajput." (১৭৭৬ এবং ১৭৮৭ সনের সরকারী রিপোর্ট)। ভবানী পাঠক ১৭৮৭ সনের জুলাই মাসে ইংরেজ সিপাইদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যায়, স্ব-ইচ্ছায় ধরা দিয়া দ্বীপান্তরে যাইবার পর নহে (আর, তখন আন্দামানে কয়েদী পাঠান প্রথা আরম্ভ হয় নাই)। ফলতঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস পদত্যাগ করিবার কয়েক বৎসর পরে এই সব ডাকাতদের দমন হয় এবং "দেবী"ও অদৃশ্য হন। দেবী চৌধুরাণী নিজ দল ভাঙ্গিবার কয়েক বৎসর আগে গুড্‌ল্যাড্ রঙ্গপুর ছাড়েন।

কিন্তু যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য। খাঁটি বাঙ্গালীরাও ডাকাতি করিত। চলনবিলের ধারে একটি গ্রামের এক বিখ্যাত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশের পুরুষেরা নৌকাযোগে ডাকাতি করিতে করিতে যে নিজের নূতন জামাইকে হত্যা করেন এবং তাহার অনুতাপে ঐ পাপ-ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন, তাহার কথা রাজশাহী-পাবনা জেলায় লোক-প্রসিদ্ধ।

আর, হেষ্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এ দেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিম মহাপণ্ডিত ছিলেন, বহু বিভিন্ন বিষয়ে

তাঁহার পড়াশোনা ছিল, এবং গভীর চিন্তার সাহায্যে পঠিত জ্ঞানকে তিনি পরিপাক করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে, 'দেবী চৌধুরাণী'র জন্য কাল ও স্থান, এ দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসন-পদ্ধতি অস্ত গিয়াছে, অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই—এই দুই মহাযুগের সন্ধিস্থল; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক। আর স্থান, সীমান্তপ্রদেশ; 'আনন্দমঠে' বন্য ঝাড়খণ্ডের প্রবেশদ্বার বীরভূম জেলা, 'সীতারামে' সমুদ্রের প্রায় ধারে কোণঠেযা ভূষণা পরগণা, আর 'দেবী চৌধুরাণী'তে রঙ্গপুর জেলা। মুঘল-যুগে মোঙ্গোল-জাতীয় কোচ ও আহোম রাজ্য তখন বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলার উত্তরের ও পূবের অনেকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সীমানা কখন আগাইত, কখন পিছাইত, সুতরাং যুদ্ধ, অন্ততঃ লুঠতরাজ নিত্যনৈমিত্তিক ছিল। সুবা বাঙ্গলার কেন্দ্রস্থ জেলাগুলিতে যেমন নিয়মবদ্ধ শাসন ও "সম্রাটের শান্তি" সজোরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সীমান্ত পরগণাগুলিতে তাহা ছিল না। মহামতি বার্ক একটি সুন্দর উপমা দিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিস্তৃত সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড হইতে প্রেরিত রক্তের বেগ অতি দূরবর্ত্তী আঙ্গুলের ডগায় পৌঁছিতে পৌঁছিতে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বীরভূম, ভূষণা, রঙ্গপুরেও তাহাই হইত। এই চিরসত্য বঙ্কিমের সৃষ্ট বিদ্রোহীদের পথ সুগম করিয়া দেয়, তাঁহাকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই।

আর তখন বাঙ্গলা দেশের রাজস্ব-বন্দোবস্তেও অরাজকতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। টোডরমলের জমি মাপিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা (জাব্তী) বাঙ্গলার কোন অংশে প্রচলিত হইবার সময় পায় নাই; সর্ব্বত্রই এক এক জন জমিদারের নিকট থোকে টাকা লইয়া বাঙ্গলার সুবাদার, তথা দিল্লীর বাদশাহ সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেন। তাহাও আবার সব জেলায় নহে। মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের পর রাঢ় অঞ্চলে মাত্র নিয়মিতভাবে ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইত। রাজশাহী (অর্থাৎ সমস্ত রাজশাহী ও পাবনা এবং বগুড়ার দক্ষিণ অংশ লইয়া প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড) ইসলাম খাঁর সময়ে সম্পূর্ণ বশীভূত হইল, এবং ঘোড়াঘাট (অর্থাৎ বর্ত্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রঙ্গপুর, এই তিনটি জেলার সীমানার মিলন-স্থানকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারি দিকে একটা বৃত্ত টানিলে যতটা জমি তাহার মধ্যে পড়ে, তাহা,) আরও পরে রীতিমত সরকারী খাজনা দিতে আরম্ভ করিল। ময়মনসিংহ জেলাটা তাহারও এক শত বৎসর পরে মুর্শিদ কুলী খাঁর প্রবল শাসনে নিয়মিত-রাজস্ব-প্রদায়ী জেলাতে পরিণত হইল, এবং সেটা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নূতন বারেন্দ্র

ব্রাহ্মণ জমিদারদের পরিশ্রমে। এইরূপে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও সুশাসন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সুবা বাঙ্গলার মোট রাজস্ব বাড়িতে লাগিল; মুর্শিদ কুলী খাঁ প্রথমে আকবরী জমা ছাড়াইয়া উঠেন, আলিবর্দ্দী তাহার উপর রাজকর কয়েক লাখ বাড়াইয়া দেন, এবং সর্ব্বশেষে হতভাগ্য মির কাসিম ইংরেজদের শোষণের ফলে মোট খাজনার পরিমাণ অসম্ভব রকম বেশী করিয়া তোলেন।

কিন্তু নবাবের শাসনশক্তি যেই পলাসী ও উদুয়ানালার যুদ্ধের ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িল, অথচ যখন ইংরেজেরা বণিকত্ব ত্যাগ করিয়া দেশশাসনের দায়িত্ব লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন রকমে খাজনার টাকা আদায় হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট, ঠিক সেই সময়, সর্ব্বপ্রথমে সীমান্ত জেলাগুলিতে শান্তি চলিয়া গেল, অরাজকতা তন্দ্রা হইতে জাগিল, প্রজা দরিদ্র হইতে লাগিল, খাজনা কোথা হইতে আসিবে? মির কাসিমের বর্দ্ধিত হারের জমা আদায় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইল। তখন সরকারী তহসিলদারগণ প্রজাদের মারপিট এবং নিজেদের উদর পূরণের জন্য লুঠ আরম্ভ করিয়া দিল। ঠিক যেমন অযোধ্যা রাজ্য যত দিন অকর্ম্মণ্য নবাবদের অধীন ছিল, তত দিন কোন জেলায় খাজনা আদায় করিতে হইলে সিপাহীর পল্টন পাঠানো আবশ্যক হইত, কখন কখন সেই সঙ্গে দুই একটা তোপও—এখানেও সেইরূপ হইল।

'দেবী চৌধুরাণী'তে বর্ণিত যুগে ইংরেজেরা জমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেন, নিলামে সর্ব্বোচ্চ দরে এক এক বৎসরের জন্য (পরে একবার ৫ বৎসরের জন্য) জমিদারীগুলি ইজারা দেওয়া হইত। ইতিহাস-পাঠক সর্ব্বদেশেই দেখিয়াছেন যে, এই কুপ্রথার ফল ভীষণ প্রজাপীড়ন, চাষের হ্রাস, জমিদারের সর্ব্বনাশ এবং রাজারও নিয়মিত বার্ষিক আয়ে দ্রুত অবনতি। দেশের এই দুর্দ্দশার চিত্র বঙ্কিম ঠিক আঁকিয়াছেন, ইহার কোন অংশ কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) আর যাহাই করুক না কেন, অনেক বৎসর ধরিয়া মফস্বলে শান্তি, প্রজার সুখ, এবং রাজস্বের নির্দ্দিষ্টতা আনিয়া দেয়। কিন্তু তাহা যখন ঘটে, তখন "দেবী চৌধুরাণী মরিয়াছে" এবং প্রফুল্ল এক পাল "বড় ডবডবে চোখ, গালফুলো" জমিদার-শাবক পালন করিতে ব্যস্ত: ডাকাত-রাণীর বজরা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে—তখন আর তাহার আবশ্যকতা নাই।

আর একটা কথা বলা আবশ্যক। ঐ নিরস্ত্র বজরাটা যেরূপে ইংরেজ সিপাইদের ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া লেফ্‌টেনান্ট ব্রেনান্‌কে বন্দী করিল, তাহা অসম্ভব মনে হইতেছে কি? জলের মধ্যে লাঠির কাছে সঙ্গীনের পরাজয় কি "বঙ্কিমের বিকৃত মস্তিষ্কের" কল্পনা মাত্র, যেমন একজন অতি প্রসিদ্ধ লেখক 'আনন্দমঠে' শান্তির ঘোড়াচড়াকে বর্ণনা করিয়াছেন?

সেই যুগে ভারতের সত্য ইতিহাসে ঠিক এইরূপ ঘটনা দুই জায়গায় দেখিতে পাই। ডাঙ্গা ও জলের সন্ধিস্থলে, যেমন নদীর ঘাটে, শিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য বড় অসুবিধায় পড়ে, সেরূপ কুস্থানে অল্পক্ষণব্যাপী দ্রুতগামী যুদ্ধে লাঠি সড়কিই বিজয়ী হয়; ডাঙ্গায় রীতিমত স্থলযুদ্ধে নহে, নৌকায় করিয়া পুরাপুরি জলযুদ্ধেও নহে। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৬৭৯ সনে খান্দেরী দ্বীপের উপর নামিতে গিয়া ছোট নৌকার আরোহী ইংরেজ সেনানী লেফটেনাণ্ট থর্প এবং আর দুই জন ইংরেজ মারা যায় এবং অনেক ইংরেজ গোরা মারাঠাদের হাতে বন্দী হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত আছে—১৭৪৮ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এন্‌সাইন্ ইংলিশ নামক কোম্পানীর সৈনিক কর্ম্মচারী কাসিমবাজার হইতে জলপথে কলিকাতায় চারি লাখ টাকার অধিক মূল্যের মাল লইয়া যাইবার সময় কাটোয়ার নিকট নদীতে কম জলে পৌঁছিলে মারাঠা সৈন্যেরা অতি সহজে বিনা রক্তপাতে তাঁহার সব মাল লুঠিয়া লয় এবং সাহেবকে নিরস্ত্র করে। আমার *Shivaji*, p. 274 এবং *Bihar & Orissa during the Fall of the Mughal Empire*, p. 98-এ ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

এই সময়কার রঙ্গপুরের ঘটনা সম্বন্ধে সরকারী কাগজপত্র হইতে নিম্নলিখিত কয়টি কথামাত্র জানা যায়—

> In [June] 1787, Lieutenant Brennan was employed against a notorious leader of dacoits, named Bhawani Pathak. He despatched a native officer with 24 sepoys, who surprised Pathak with 60 of his followers, in their boats. A fight took place in which Pathak himself and three of his lieutenants were killed and eight wounded, besides 42 taken prisoners. We catch a glimpse from the Lieutenant's report of a female dacoit, by name Devi Chaudhurani, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of barkandazes in her pay, and committed dacoities on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title of *Chaudhurani* would imply that she was a zamindar, probably a petty one, else she need not have lived in boats for fear of capture
>
> On receiving Lieut. Brennan's report, the Collector of Rangpur wrote to him, on 12th July 1787,..."I cannot at present give you any orders with respect to the female dacoit mentioned in your letter. If on examination of [the] Bengal[i] papers which you have sent it shall appear that there are sufficient grounds for apprehending her,...I shall send you such orders as may be necessary."

জমিদার হরবল্লভের নামটি বঙ্কিম গ্লেজিয়ার সংকলিত *Notes on Rungpore* হইতে

লইয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, ঐ সময়ে হরকান্ত (অথবা হরনাথ) নামক এক জন বড় রাজস্বকর্ম্মচারীকে নিয়মভঙ্গ অপরাধে প্রথমে জেলে আটক করিয়া রাখা, এবং পরে উপরের কর্ত্তাদের হুকুমে ঐ জেলা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

ইহাই হইল 'দেবী চৌধুরাণী'র ঐতিহাসিক তথ্য, অর্থাৎ তথ্যের একান্ত অভাব। কিন্তু এই জাতীয় কচকচির উপর কোন মহাকাব্যের মূল্য একেবারেই নির্ভর করে না। 'আনন্দমঠ' 'সীতারাম' 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিম কাব্য-রচনা করিতে বসিয়াছিলেন— 'রাজসিংহ' এ তিনটি অপেক্ষা অনেক অধিকমাত্রায় ঐতিহাসিক হইলেও তাহাকে কাব্য বলা ভুল হইবে, যদি "কাব্য" বলিতে জীবনের অন্তস্তলের পর্য্যালোচন, "a criticism of life" (ম্যাথু আর্নল্‌ডের ব্যাখ্যা) বুঝি। এই তিনখানি মহাগ্রন্থে ইতিহাস লেখা, এমন কি, ঐতিহাসিক দৃশ্যপট আঁকা পর্য্যন্ত বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না ; মানবের হৃদয়কে দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত করা, তাহাকে ঊর্দ্ধতম স্তরে তুলিয়া দেওয়া, এ ক্ষেত্রে ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিভার কাজ। এই 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথম ছত্রেই তিনি অধ্যাপক সীলীর বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রচার করিয়াছেন—"The substance of religion is Culture ; the fruit of it, the Higher Life."

অর্থাৎ স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের মধ্যে সম্বন্ধ বজায় রাখাই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, আর প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন, সংযম ও আত্মত্যাগ—এই তিনটি বহু দিন ধরিয়া সাধনা করিলে তবে ঐ সিদ্ধিতে উপনীত হওয়া যায়। প্রফুল্লের জীবন তাহার চরম দৃষ্টান্ত, শান্তি এবং শ্রীও এই সাধনার ভিতর দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফলে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যই বঙ্কিমের শিল্প-কৌশলের প্রমাণ।

শান্তি, প্রফুল্ল, শ্রী—এ তিন জন নায়িকাকে দূর হইতে দেখিলে একই ছাঁচে ঢালা বলিয়া ভ্রম হওয়া সহজ। তিন জনই অনুপমা সুন্দরী, আবার তাহাদের "বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর" ['দেবী চৌধুরাণী', ১-১৪] ; "হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী" ['সীতারাম', ১-১০] ; "[আমাকে বীরব্রত] শিখাইলে ত" ['আনন্দমঠ', ৩-৩]। তিন জনই অতি দরিদ্রের কন্যা, পিতৃহীনা অসহায়া, অল্পবয়সে বিবাহিতা, কিন্তু তিন জনেই স্বামিসঙ্গ-বঞ্চিতা। তিন জনকেই জীবনে প্রায় একই রকম অসাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়া চলিতে হইল ;—সেই কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, সধবা হইয়া বিধবার মত ব্রহ্মচারিণী, নিজগৃহ পর্য্যন্ত নাই, দেশপর্য্যটন, শারীরিক বল ও ব্যায়াম অভ্যাস, গীতাপাঠ, নিষ্কামধর্ম্ম শিক্ষা—এই সবগুলি দিয়া যৌবনে তাহাদের চরিত্র

গড়িয়া উঠিল। পাড়াগেঁয়ে বাঙ্গালী ভদ্রঘরের কোমলা নারী, শেষে বিদ্রোহী সন্তানবীর, ডাকাতের সর্দ্দার, "সিংহবাহিনী মূর্ত্তি" বা ভৈরবী হইয়া দাঁড়াইল। অতি দীর্ঘকাল দুঃখে দহিয়া, দৈন্য সহিয়া, আত্মসংযম করিয়া তবে তাহারা এত শক্ত হইল। এর মধ্যে শান্তির শরীরগঠন ও যোগশিক্ষা আগেই হইয়া গিয়াছিল, আর দুইটির হইল "মহাপুরুষ"-জাতীয় জীবের অধীনে আসিয়া। তিন জনের অভিজ্ঞতা একই রকমের, শুধু অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সময়ে পার্থক্য।

অথচ এই তিনটি বিরহিণীর চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা নহে। এত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও স্বামি-পরিত্যক্তা শান্তিকে কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই ('আনন্দমঠ,' ২-৭ বাদে)। সে কাঁদিয়াছিল শুধু একদিন, গ্রন্থশেষে (৪-৭) সেই পূর্ণিমার রাত্রে, সেই শেষ যুদ্ধের পর—

"বিজন বনে তমসা নিশীথে
মৃত পতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী"

যে জন্য কাঁদিয়াছিল।

আর প্রফুল্ল? তাহার প্রথম-প্রথমকার কান্না দেখিয়া নয়ান বউয়ের বিষাক্ত বর্ণনা মনে পড়ে—

সাগর। দেখতে কেমন?
নয়ন। যেন গালফুলো গোবিন্দের মা। (৩-১৩)।

কিন্তু সেই প্রফুল্লই যখন নিশ্চয় জানিল যে, শ্বশুর কিছুতেই তাহাকে বাড়ীতে স্থান দিবেন না, তখন, "প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল।" (১-৩)। আবার পরদিন যখন সতান তীক্ষ্ণ ছুরি মারিয়া বলিল, "দিদি, ঠাকুর তোমার কথার কি উত্তর দিয়াছেন, শুনেছ?…ঠাকুর বলিয়াছেন, [তোমাকে] চুরি ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিও"—তখনও প্রফুল্ল কাঁদিল না, "দেখা যাবে" বলিয়া নীরবে বিদায় লইল। (১-৬)। জ্বলন্ত লোহা হাতুড়ির আঘাত পাইয়া শক্ত হইতে আরম্ভ করিল।

ইহার অতি অল্পকাল পরে, তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব্বে, সে একবার কাঁদিয়াছিল বটে, কিন্তু সেটা গার্হস্থ্য জীবনের শেষ আশাকে বিদায় দিবার জন্য নয় কি?

প্রফুল্ল। মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?
নিশি। মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।
প্রফুল্ল। আমি তা আজও জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।
প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিশি বলিল, "বুঝিয়াছি বোন্,

তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।" নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতি-ভক্তি। (১-১৩)।

কিন্তু দশ বৎসরের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা ও আত্মসংযমের ফলে এই কোমল বাঙ্গালীর মেয়ে নিষ্কামধর্ম্ম শিখিয়াছে, অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে। অবশেষে যখন ভাবিল যে, আজ জীবনান্তে ব্রজেশ্বরের দেখা পাইয়াছে, তখন "প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া, চোখের জলের স্রোত ছুটিল" (৩-২)। সে যে তখন মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে; শ্বশুরের মানরক্ষা করিবার জন্য, শত শত অনুচরকে বৃথা যুদ্ধ হইতে বাঁচাইবার জন্য, নিজে হইতে সাহেবদের কাছে ধরা দিবে, বিষ খাইয়া মরিবে; এই তো জীবনের শেষ দিন আসিয়াছে; আজিকার দিন সেই পূর্ব্বের দশ বৎসরের জীবন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলিবে।

ফলতঃ প্রফুল্লকে অন্তরে গৃহিণী করিয়া বঙ্কিম সৃষ্টি করিয়াছেন; শান্তি ছিল বনের পাখী, ঘরের খাঁচা তাহার জন্য নয়; শ্রী গৃহিণী হইতে পারিত, হইতে পারিলে সুখী হইত, কিন্তু জ্যোতিষে বিশ্বাসের ফলে কঠোর আত্মত্যাগ করিয়া নিজেকে জোর করিয়া ঘর-সংসার হইতে দূরে টানিয়া ফেলিল। নিশি সহজেই প্রফুল্লকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল—

> নিশি বলিল, "এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম? এ কি সন্ন্যাস?...ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।...তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।"
>
> দেবী। 'সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না।' (২-৮)।

প্রফুল্ল জানিত যে, স্ত্রীজীবনের পূর্ণ বিকাশ রূপে নহে, অর্থ-লাভে প্রতাপ-চালনে বা ভোগে নহে, কেবল মাতৃত্বে। বৃক্ষের অভিব্যক্তির শেষ এবং সর্ব্বোচ্চ স্তর ফলে,—পাতায় নহে, ফুলে নহে, গন্ধে নহে। তাই প্রফুল্ল ঘরে ফিরিল।

আর শ্রী? সেও গৃহিণী হইবার উপযুক্ত মন প্রাণ লইয়াই জগতে আসিয়াছিল; পরিত্যাগকারী, পর-হইয়া-যাওয়া স্বামীর জন্য তাহারও প্রাণ পাগল—

> শ্রী—"আমি ঈশ্বর জানি না—স্বামীই জানি।...স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। যে দিন বালিকা-বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।...কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি।" ('সীতারাম', ১-১৪)।

অর্থাৎ শ্রীও প্রফুল্লের শেষ পরিণতিতে পৌছিয়া সন্ন্যাসিনীত্ব গৃহিণীত্বে লুপ্ত করিতে

পারিত ; কিন্তু করিল না ; দূরে রহিল, সীতারামের কাছে ধরা দিল না। কেন ? তাহার অদৃষ্ট, সীতারামের অদৃষ্ট,—অর্থাৎ যাহা মানুষ আগে হইতে দেখিতে পায় না, এমন একটা শক্তি দু-জনার সমস্ত পুরুষকার, সমস্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ ব্যর্থ করিয়া দিল। সেই ধ্বংসকারী বন্যার স্রোতে এ দুই জন তো ভাসিল, আর ভূষণারাজ্য লোপ পাইল, চন্দ্রচূড় বিফল হইলেন, শত শত নিরপরাধ কুলবধূ পর্য্যন্ত এই প্রলয়ে ডুবিল। ইহাই প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল,—যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে মানবের শত চেষ্টা, সহস্র বুদ্ধি, হৃদয়ের রক্তদান, সকলই বিফল হইবে, যেমন ভাগীরথী-স্রোতে ঐরাবতও ভাসিয়া যায়। অদৃষ্টের বাণী আসিল যে, যদি রাজা লেয়াস্ নব-পরিণীতা রাণী জোকাষ্টাকে লইয়া ঘর-সংসার করেন, তবে তাঁহাদের পুত্র পিতৃহন্তা ও মাতৃগামী হইবে। ইহার বিরুদ্ধে সব চেষ্টা ও আয়োজন করা হইল, কিন্তু মানবগণ জানিল না, বুঝিল না, কেমন করিয়া এই ভবিতব্য অবশেষে ঘটিল ; আর তাহার ফলে লেয়াস্ অপঘাতে মারা গেলেন, জোকাষ্টা আত্মহত্যা করিল, তাহাদের অদৃষ্টের শাপে দগ্ধ পুত্র ইডিপাস নিজের চোখ উপড়াইয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতেও অদৃষ্টের কোপের প্রলয় থামিল না,—ইডিপাসের দুই পুত্র পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিল, দেবী-প্রতিমা কন্যা এন্টিগনী মরিল, সেই কন্যার প্রেমিক মরিল, তাহাদের দেশ পর্য্যন্ত অভিশপ্ত, যুদ্ধে ছারখার হইল, এবং এই ধ্বংসের জের আরও এক পুরুষ পর্য্যন্ত চলিল, ["এপিগনী"]। সফোক্লিসের নাট্য-প্রতিভা এই সত্যকে সাহিত্যে চির অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

সেই মত, শ্রী নিজকে জোর করিয়া সীতারাম হইতে দূরে রাখিল বটে, কিন্তু "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী" হইলই হইল, এক অভাবনীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রকারে। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে অদৃষ্টের খেলা নাই, সেখানে পুরুষকারই জয়ী। এই অন্তঃস্থিত মহাপার্থক্য ঐ আর দুইখানি উপন্যাসের কার্য্যকলাপ ও ফলাফল 'সীতারাম' হইতে পৃথক্‌জাতীয় করিয়া দিয়াছে।

শান্তি বনের পাখী, অবশেষে বনে—অর্থাৎ "হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিতে" (৪-৭) উড়িয়া গেল। শ্রী প্রলয়ের স্রোতে "কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না" ('সীতারাম', ৩-২৩)।

আর প্রফুল্ল, সে ঘরে ফিরিল।

সাগর—"এখন গৃহস্থালীতে মন টিকিবে ? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে ? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্ম-ঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে ?"

প্রফুল্ল—"ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।...কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগ কঠিন নয়।...আমি এই সন্ন্যাস করিব।"...সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত—সে কথা দূরে থাকুক, কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর-পরিচয়ও আছে। (৩-১৩-১৪)।

একজন মহাকবি,—ইংরেজ, কিন্তু ঋষির মত দিব্যদ্রষ্টা—ভরত পক্ষীকে দেখিয়া বলিয়াছেন, "তুমিই প্রকৃত জ্ঞানী, তুমি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছ"—

Type of the wise, who soar but never roam,
True to the kindred points of heaven and home.

প্রফুল্লের জীবনও এই চরম সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত; নিষ্কাম ধর্ম্মে, দশ বৎসর ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যে গঠিত, "দেবী"ই আদর্শ গৃহিণী হইতে পারেন। তাই বঙ্কিম বলিতেছেন—

"এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমাকে দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন।...কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম'।"

এই চিরন্তন প্রফুল্ল ১৭৭৬-১৭৮৬ সনের বঙ্গদেশ হইতে অনেক দূরে, অনেক উপরে।

ভূমিকা

(সম্পাদকীয়)

ইতিহাসের দিক্ দিয়া 'দেবী চৌধুরাণী' সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার তাঁহার ভূমিকায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রফুল্ল-চরিত্রে যে নারীজীবনের পূর্ণ বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে, 'সীতারামে'র শ্রী ও 'আনন্দমঠে'র শান্তির সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তিনি তাহাও দেখাইয়াছেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয়। ইহার কিছু কাল পরে একটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়; নিছক শিল্পসৃষ্টির জন্য গল্প রচনা হইতে তিনি বিরত হন। এখন হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি 'রাজসিংহ' নামে একটি "ক্ষুদ্র কথা" মাত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ'কে বর্ত্তমান বৃহৎ রূপ দিয়াছিলেন। ১৮৮২ হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি মাত্র তিনখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। এই উপন্যাস তিনখানি ('আনন্দমঠ'—১৮৮২; 'দেবী চৌধুরাণী'—১৮৮৪; 'সীতারাম'—১৮৮৭) তাঁহার পূর্ব্বেকার সকল গল্প উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত। যে 'অনুশীলনতত্ত্ব' লইয়া তিনি শেষজীবনে অবিরত মাথা ঘামাইতেন, উপন্যাসচ্ছলে তাহারই সহজ প্রচারের জন্য তিনি এই তিনটি উপন্যাসের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এগুলিকে 'অনুশীলনতত্ত্ব' প্রচারের একটা "কল" বলিয়া গিয়াছেন। এই তিনখানি উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের "ত্রয়ী" নামে প্রসিদ্ধ।

স্মরণ রাখিতে হইবে, পাদরি হেস্টির সহিত 'স্টেটস্‌ম্যানে' বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত তর্কযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই 'দেবী চৌধুরাণী' রচনার সূত্রপাত হয়। অনুশীলনধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্যকে দৃষ্টান্তসহযোগে সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিবার এই সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের "ত্রয়ী" লইয়া এখন পর্য্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিপিনচন্দ্রের আলোচনা নানা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। তন্মধ্যে অধুনালুপ্ত 'নারায়ণ' ও 'বঙ্গবাণী'র নাম করা যাইতে পারে। পাঁচকড়িবাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' প্রবন্ধ

১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণে' মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা সেই প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারাম লিখিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্কাপনোদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" বাঙ্গালার গান, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে; এই তিনখানা উপন্যাসে কেবল বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কথা আছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ইঙ্গিত মাত্র নাই। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালার পরিচায়ক, বাঙ্গালিত্বের পরিচায়ক, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা সবাই বাঙ্গালী, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালী কুলাঙ্গনা, সীতারাম বাঙ্গালী ভৌমিক, চন্দ্রচূড় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। এই তিনখানা উপন্যাসই বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" গানই বাঙ্গালীকে বঙ্গভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে।...

এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবী চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা State বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে, তাহার পর্য্যায় দেখাইয়াছেন।...সন্ন্যাসীর গৈরিক লেখা তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই দুই জাতি ছাড়া সমাজের কোনরূপ ভাঙ্গা গড়া হয় নাই। তাই তিনি এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। আনন্দমঠে মহেন্দ্র সিংহ সন্তান বটে, কিন্তু তিনি সন্ন্যাস পান নাই। দেবী চৌধুরাণী ব্রাহ্মণকন্যা; সীতারাম কায়স্থ ভৌমিক ও সেনাপতি। আনন্দমঠে তিনি ঠিক সাম্প্রদায়িক ভাবে সমাজের সংস্কার চেষ্টা করিয়াছেন; দেবী চৌধুরাণীতে শক্তিকে সর্ব্বসিদ্ধি আধারভূতা করিয়া বঙ্গীয় মানবতার উন্মেষ সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন; সীতারাম উপন্যাসে শক্তি বিরূপা হইলে, পুরুষ মোহান্ধ হইলে, কেমন বাড়াভাতে ছাই পড়ে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালিত্বের শ্লাঘা ও অপহ্নব ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দেবী চৌধুরাণী'র যে মূলগত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বঙ্কিমের মনোগত অভিপ্রায় আমাদের নিকট অনেকটা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার culture বা অনুশীলন তত্ত্বের সাহায্যে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবার ground বা চিত্রের ক্ষেত্র রচিবার প্রয়াসটা বেশ

পরিস্ফুট। দেবী চৌধুরাণীর ক্ষেত্র অতি সুন্দর না হইলেও মনোহর বটে। দেবী চৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তি-মূর্ত্তি—কমলা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে; অথচ তিনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব বৈষ্ণবঠাকুরাণী। যখন শক্তি-মূর্ত্তি, তখন পুরুষ সম্মূঢ়; ব্রজেশ্বর পিতৃশাসনে সম্মূঢ়, প্রফুল্লর রূপে সম্মূঢ়। এই পুরুষের তৃপ্তি-তুষ্টি সাগর বৌ, বিরক্তি ও বিধৃতি নয়ান বৌ এবং ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণী। প্রফুল্লকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালিনী করিতে যাইয়া কবি গোলে পড়িয়াছেন। প্রফুল্লকে এক রাত্রির জন্য স্বামিসঙ্গে সুখী করিয়া কবি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের পথে একটা কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পরিণাম দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের গৃহে আসিয়া বাসন মাজা—ঘর-সংসার দেখা। যেমন কর্ম্মী তেজস্বী ব্রাহ্মণ ডাকাতের হাত দিয়া কবি দেবীরাণীকে গড়িয়া তুলিলেন, সে গড়নের ফলে পুরুষ ব্রজেশ্বর সোনা হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু কবি প্রফুল্লের সংস্পর্শে ব্রজেশ্বরের মানবতার উন্মেষ-ভঙ্গী দেখান নাই। যেন প্রফুল্ল আসাতেই নয়ান বৌয়ের ঝগড়া থামিল, সাগর বৌয়ের অভিমান দূর হইল, আর ব্রজেশ্বর যেন "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ" পুরুষের হিসাবে, প্রফুল্লের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রফুল্ল, সাগর ও নয়ান বৌ—এই তিন গুণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই তিনের সমাধান করিলেন প্রফুল্ল, সংসারে একটা negative সুখের বা স্বস্তির লহর তুলিলেন প্রফুল্ল, ফলভাগী হইল ব্রজেশ্বর। এইটুকুর জন্য প্রফুল্লকে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞান, সবই শিখিতে হইল, কুস্তী করিতে হইল, লাঠি খেলিতে হইল, নানা ভঙ্গীতে ত্যাগের মক্স করিতে হইল, দেবীরাণীর দোকানদারী বসাইতে হইল, ডাকাতের দলের সর্দ্দার হইতে হইল! ভবানী পাঠকের গুরুগিরির পর্য্যবসান হইল সাদামাঠা গৃহস্থের কুলাঙ্গনার ঘর-গৃহস্থালীর কার্য্যে—বাসনমাজায় ও সপত্নীবশীকরণে। আদিরসের কবি আদিরসটুকু ভুলিতে পারেন নাই, domesticityর লোভটুকু সামলাইতে পারেন নাই। এতটা শিক্ষার পরেও প্রফুল্ল বৈষ্ণবী হইতে পারিলেন না, তান্ত্রিক মতে শাক্ত ভৈরবী হইতেও পারেন নাই।... কিন্তু প্রফুল্ল-চরিত্র অপূর্ব্ব; উহা বাঙ্গালার নহে, অথচ বেশ বাঙ্গালীয়ানা মাখান। উহা বাঙ্গালীর ঘরে কখনও ছিল না, বাঙ্গালীর ঘরে কখনও হইবে না।

যাজপুর হইতে বদলি হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। যাজপুরেই 'দেবী চৌধুরাণী' রচনার সূত্রপাত। শচীশ-চন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী'তে (৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৩১-৩৩) এই সময়ের একটি ডাকাতির উল্লেখ আছে, বঙ্কিমচন্দ্র যাহার অভিজ্ঞতা 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রয়োগ করিয়াছেন। ওয়েস্টমেকট সাহেব তখন হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার সুরু হইতেই খিটিমিটি বাধিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় বউবাজার স্ট্রীটে বাসা লইয়া, সেখান হইতে হাওড়া যাতায়াত করিতেন। সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র অবস্থা তখন কাহিল, মার্চ মাস পর্য্যন্ত (চৈত্র, ১২৮৯) কোনও রকমে বাহির হইয়া তাহা বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'

নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্য কলিকাতার বউবাজারের বাসায় বসিয়া 'দেবী চৌধুরাণী' রচনা করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও 'বঙ্গদর্শন'কে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক হইতে আবার বাহির হইয়া মাঘে উহা চিরতরেই বন্ধ হইয়া যায়, 'দেবী চৌধুরাণী'র দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র শেষ হয়। ওয়েস্ট্‌মেকট সাহেবের হুকুমে বাধ্য হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে হাওড়ায় বসবাস করিতে হয়। 'দেবী চৌধুরাণী' পুস্তকাকারে বাহির হয় ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে—পুস্তকাকারে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেন।

বিপিনচন্দ্র পাল ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়,* পূর্ণচন্দ্র বসু, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতিও 'দেবী চৌধুরাণী' লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' পুস্তকে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'দেবী চৌধুরাণী'কে রোমান্স পর্য্যায়ে ফেলিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'দেবী চৌধুরাণী'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ পাণ্ডুলিপি আকারেই ছিল। এই পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে এবং সেই অংশটুকু এই রচনাবলীর ইংরেজী খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর হইতে তুলসীরাম এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ হইতে জে. প্রসাদ ইহার হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভি. অম্মল মাদ্রাজ হইতে 'দেবীচন্দ্রপ্রভা' নাম দিয়া ইহার তামিল অনুবাদ, মস্‌লিপটম হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সি. ভাস্কর রাও ইহার তেলুগু অনুবাদ এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর হইতে বি. ভেঙ্কটাচার্য্য ইহার কানাড়ী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কেদারনাথ বিশ্বাস 'ভবানীপাঠক' নাম দিয়া 'দেবী চৌধুরাণী'র এক অতি অক্ষম পরিশিষ্ট প্রকাশ করেন।

---

* "যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঠিক সেই সময়ে, অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবুর 'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশিত হয়। আমি ঐ পুস্তকের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা করি। তাহা আমাদের পাক্ষিকেই প্রকাশিত হয়। আর কোন কাগজেই দেবী চৌধুরাণীর অত বড় বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। ভূদেববাবু ঐ সমালোচনা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন এবং 'এডুকেশন গেজেটে' "উচ্চ অঙ্গের সমালোচনা" বলিয়া উল্লেখও করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহার পুস্তকের ঐ সমালোচনা দেখিয়া সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কোনও বন্ধুর নিকট সমালোচকের তত্ত্ব লইয়াছিলেন।"—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, 'নারায়ণ', বৈশাখ ১৩২২, পৃ. ৬৬৫-৬।

যাঁহার কাছে

প্রথম নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম,

যিনি স্বয়ং

নিষ্কাম ধর্ম্মই ব্রত করিয়াছিলেন,

যিনি এখন

পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়,

তাঁহার

পবিত্র পাদপদ্মে

এই গ্রন্থ

ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।

The Substance of Religion is Culture.

"The Fruit of it The Higher Life"—*Natural Religion by the Author of Ecce Homo, p. 145.*

"The General Law of Man's Progress, whatever the point of view chosen, consists in this that Man becomes more and more Religious"—*Auguste Comte—Catechism of Positive Religion—English Translation by Congreve, 1st Edition, p. 374.*

বিজ্ঞাপন

দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশমাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

"আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই।' এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব।

দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ একটু ঐতিহাসিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হণ্টর সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার "Statistical Account" মধ্যে রঙ্গপুর জিলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। সে কথাটা বড় বেশী নয়, এবং "দেবী চৌধুরাণী" গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুড্‌ল্যাড্ সাহেব, লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ, সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্য্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী।"

"যাই মা।"

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল। বলিল, "কেন মা?"

মা বলিল, "যা না—ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।"

প্রফুল্লমুখী বলিল, "আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।"

মা। তবে খাবি কি? আজ ঘরে যে কিছু নেই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা?

মা। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলি। কাঙ্গাল গরিবের চাইতে লজ্জা কি?

প্রফুল্ল কথা কহিল না। মা বলিল, "তুই তবে ভাত চড়াইয়া দে, আমি কিছু তরকারির চেষ্টায় যাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার মাথা খাও, আর চাইতে যাইও না। ঘরে চাল আছে, নুন আছে, গাছে কাঁচা লঙ্কা আছে—মেয়ে মানুষের তাই ঢের।"

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল। ভাতের জল চড়াইয়াছিল, মা চাল ধুইতে গেল। চাল ধুইবার জন্য ধুচুনী হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলিল, "চাল কই?" প্রফুল্লকে দেখাইল, আধ মুটা চাউল আছে মাত্র—তাহা একজনেরও আধপেটা হইবে না।

মা ধুচুনী হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রফুল্ল বলিল, "কোথা যাও?"

মা। চাল ধার করিয়া আনি—নইলে শুধু ভাতই কপালে যোটে কই?

প্র। আমরা লোকের কত চাল ধারি—শোধ দিতে পারি না—তুমি আর চাল ধার করিও না।

মা। আবাগীর মেয়ে, খাবি কি? ঘরে যে একটি পয়সা নাই।

প্র। উপস্ করিব।

মা। উপস্ করিয়া কয় দিন বাঁচিবি?

প্র। না হয় মরিব।

মা। আমি মরিলে যা হয় করিস্; তুই উপস্ করিয়া মরিবি, আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। যেমন করিয়া পারি, ভিক্ষা করিয়া তোকে খাওয়াইব।

প্র। ভিক্ষাই বা কেন করিতে হইবে? এক দিনের উপবাসে মানুষ মরে না। এসো না, মায়ে ঝিয়ে আজ পৈতে তুলি। কাল বেচিয়া কড়ি করিব।

মা। সূতা কই?

প্র। কেন, চরকা আছে।

মা। পাঁজ কই?

তখন প্রফুল্লমুখী অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। মা ধুচুনী হাতে আবার চাউল ধার করিয়া আনিতে চলিল, তখন প্রফুল্ল মার হাত হইতে ধুচুনী কাড়িয়া লইয়া তফাতে রাখিল। বলিল, "মা, আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে?"

মা চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল, "সবই ত আছে মা—কপালে ঘটিল কৈ?"

প্র। কেন ঘটে না মা—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বশুরের অন্ন থাকিতে আমি খাইতে পাইব না?

মা। এই অভাগীর পেটে হয়েছিলে, এই অপরাধ—আর তোমার কপাল। নহিলে তোমার অন্ন খায় কে?

প্র। শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে, তবে খাইব—নইলে আর খাইব না। তুমি চেয়ে চিন্তে যে প্রকারে পার, আনিয়া খাও। খাইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আইস।

মা। সে কি মা! তাও কি হয়?

প্র। কেন হয় না মা?

মা। না নিতে এলে কি শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে?

প্র। পরের বাড়ী চেয়ে খেতে আছে, আর না নিতে এলে আপনার শ্বশুরবাড়ী যেতে নেই?

মা। তারা যে কখনও তোমার নাম করে না।

প্র। না করুক—তাতে আমার অপমান নাই। যাহাদের উপর আমার ভরণ-পোষণের ভার, তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব—তাহাতে আমার লজ্জা কি?

মা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "তোমাকে একা রাখিয়া আমি যাইতে চাহিতাম না—কিন্তু আমার দুঃখ ঘুচিলে তোমারও দুঃখ কমিবে, এই ভরসায় যাইতে চাহিতেছি।"

মাতে মেয়েতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মা বুঝিল যে, মেয়ের পরামর্শই ঠিক। তখন মা, যে কয়টি চাউল ছিল, তাহা রাঁধিল। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই খাইল না। কাজেই তাহার মাতাও খাইল না। তখন প্রফুল্ল বলিল, "তবে আর বেলা কাটাইয়া কি হইবে? অনেক পথ।"

তাহার মাতা বলিল, "আয় তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।"

প্রফুল্ল বলিল, "না, থাক্।"

মা ভাবিল, "থাক্। আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না।"

মেয়ে ভাবিল, "থাক্। সেজে গুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি!"

তখন দুই জনে মলিন বেশে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম; সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়। প্রফুল্লের দশা যেমন হউক, তাহার শ্বশুর হরবল্লভবাবু খুব বড়মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারী আছে, দোতালা বৈঠকখানা, ঠাকুরবাড়ী, নাটমন্দির, দপ্তরখানা, খিড়কিতে বাগান, পুকুর প্রাচীরে বেড়া। সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মাতা ও কন্যা অনশনে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশকালে প্রফুল্লের মার পা উঠে না। প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া যে হরবল্লভবাবু তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে। বিবাহের পরে একটা গোল হইয়াছিল। হরবল্লভ কাঙ্গাল দেখিয়াও ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি পরমসুন্দরী, তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন। এদিকে প্রফুল্লের মা, কন্যা বড়মানুষের ঘরে পড়িল, এই উৎসাহে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বিবাহতেই—তাঁর যাহা কিছু ছিল, ভস্ম হইয়া গেল। সেই অবধি এই অন্নের কাঙ্গাল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও—সর্ব্বস্বই তার কত টাকা?—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক্ কুলান করিতে

পারিল না। বরযাত্রদিগের লুচি মণ্ডায়, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, উত্তম ফলাহার করাইল। কিন্তু কন্যাযাত্রগণের কেবল চিঁড়া দই। ইহাতে প্রতিবাসী কন্যাযাত্রেরা অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা খাইলেন না—উঠিয়া গেলেন। ইহাতে প্রফুল্লের মার সঙ্গে তাঁহাদের কোন্দল বাঁধিল ; প্রফুল্লের মা বড় গালি দিল। প্রতিবাসীরা একটা বড় রকম শোধ লইল।

পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভ বেহাইনের প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা কেহ গেল না—একজন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, যে কুলটা, জাতিভ্রষ্টা, তাহার সঙ্গে হরবল্লভবাবুর কুটুম্বতা করিতে হয় করুন,—বড়মানুষের সব শোভা পায়, কিন্তু আমরা কাঙ্গাল গরিব, জাতই আমাদের সম্বল—আমরা জাতিভ্রষ্টার কন্যার পাকস্পর্শে জলগ্রহণ করিব না। সমবেত সভামধ্যে এই কথা প্রচার হইল। প্রফুল্লের মা একা বিধবা, মেয়েটি লইয়া ঘরে থাকে—তখন বয়সও যায় নাই—কথা অসম্ভব বোধ হইল না, বিশেষ, হরবল্লভের মনে হইল যে, বিবাহের রাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহ-বাড়ীতে খায় নাই। প্রতিবাসীরা মিথ্যা বলিবে কেন? হরবল্লভ বিশ্বাস করিলেন। সভার সকলেই বিশ্বাস করিল। নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিল বটে—কিন্তু কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না। পরদিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি প্রফুল্ল ও তাহার মাতা তাঁহার পরিত্যাজ্য হইল। সেই অবধি আর কখন তাহাদের সংবাদ লইলেন না ; পুত্রকে লইতেও দিলেন না। পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। প্রফুল্লের মা দুই এক বার কিছু সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছিল, হরবল্লভ তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আজ সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে প্রফুল্লের মার পা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন্যা ও মাতা সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কর্ত্তা অন্তঃপুরমধ্যে আপরাহ্নিক নিদ্রার সুখে অভিভূত। গৃহিনী—অর্থাৎ প্রফুল্লের শাশুড়ী, পা ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেছিলেন। এমন সময়ে, সেখানে প্রফুল্ল ও তাহার মা উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল মুখে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার বয়স এখন আঠার বৎসর।

গিন্নী ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কে গা ?"

প্রফুল্লের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি বলিয়াই বা পরিচয় দিব ?"

গিন্নী। কেন—পরিচয় আবার কি বলিয়া দেয় ?

প্রফুল্লের মা। আমরা কুটুম্ব।

গিন্নী। কুটুম্ব? কে কুটুম্ব গা?

সেখানে তারার মা বলিয়া একজন চাকরাণী কাজ করিতেছিল। সে দুই এক বার প্রফুল্লদিগের বাড়ী গিয়াছিল—প্রথম বিবাহের পরেই। সে বলিল, "ওগো, চিনেছি গো! ওগো চিনেছি! কে! বেহান?"

(সেকালে পরিচারিকারা গৃহিণীর সম্বন্ধ ধরিত।)

গিন্নী। বেহান? কোন্ বেহান?

তারার মা। দুর্গাপুরের বেহান গো—তোমার বড় ছেলের বড় শাশুড়ী।

গিন্নী বুঝিলেন। মুখটা অপ্রসন্ন হইল। বলিলেন, "বসো।"

বেহান বসিল—প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে গা?"

প্রফুল্লের মা বলিল, "তোমার বড় বউ।"

গিন্নী বিমর্ষ হইয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তোমরা কোথায় এসেছিলে?"

প্রফুল্লের মা। তোমার বাড়ীতেই এসেছি।

গিন্নী। কেন গা?

প্র, মা। কেন, আমার মেয়েকে কি শ্বশুরবাড়ীতে আসিতে নাই?

গিন্নী। আসিতে থাকিবে না কেন? শ্বশুর শাশুড়ী যখন আনিবে, তখন আসিবে। ভাল মানুষের মেয়েছেলে কি গায়ে প'ড়ে আসে?

প্র, মা। শ্বশুর শাশুড়ী যদি সাত জন্মে নাম না করে?

গিন্নী। নামই যদি না করে—তবে আসা কেন?

প্র, মা। খাওয়ায় কে? আমি বিধবা অনাথিনী, তোমার বেটার বউকে আমি খাওয়াই কোথা থেকে?

গিন্নী। যদি খাওয়াইতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন?

প্র, মা। তুমি কি খাওয়া পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে? তা হলে সেই সঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক-পোষাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই?

গিন্নী। আ মলো! মাগী বাড়ী ব'য়ে কোঁদল করতে এসেছে দেখি যে?

প্র, মা। না, কোঁদল করিতে আসি নাই। তোমার বউ একা আস্তে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌঁছিয়াছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া প্রফুল্লের মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অভাগীর তখনও আহার হয় নাই।

মা গেল, কিন্তু প্রফুল্ল গেল না। যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল, তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিল, "তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। নড় না যে?

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। কি জ্বালা! আবার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে না কি?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল; চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর কর্‌তে পেলেম না!" মন একটু নরম হলো।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নী। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে, তোমায় নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে কর্‌বে বলে, কাজেই তোমায় ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ীর মন আরও নরম হলো। বলিলেন, "কি কর্‌ব মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?"

গিন্নী আর যুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে, তিনি কি বলেন। তুমি এখানে বসো মা, বসো।"

প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল। সেই সময়ে, একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা—সেও সুন্দরী, মুখে আড়ঘোমটা—সে প্রফুল্লকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। প্রফুল্ল ভাবিল, এ আবার কি? উঠিয়া বালিকার কাছে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যখন গৃহিণী ঠাকুরাণী হেলিতে দুলিতে হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্ত্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা, তখন কর্ত্তা মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ; হাতে মুখে জল দেওয়া হইয়াছে—হাত মুখ মোছা হইতেছে। দেখিয়া, কর্ত্তার মনটা কাদা করিয়া ছানিয়া লইবার জন্য গৃহিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "কে ঘুম ভাঙ্গাইল ? আমি এত ক'রে বারণ করি, তবু কেউ শোনে না !"

কর্ত্তা মহাশয় মনে মনে বলিলেন, "ঘুম ভাঙ্গাইবার আঁধি তুমি নিজে—আজ বুঝি কি দরকার আছে ?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কেউ ঘুম ভাঙ্গায় নাই। বেশ ঘুমাইয়াছি—কথাটা কি ?"

গিন্নী মুখখানা হাসি-ভরাভরা করিয়া বলিলেন, "আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। তাই বল্‌তে এসেছি।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া এবং একটু একটু নথ ও বাউটি নাড়া দিয়া—কেন না, বয়স এখনও পঁয়তাল্লিশ বৎসর মাত্র—গৃহিণী, প্রফুল্ল ও তার মাতার আগমন ও কথোপকথনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন। বধূর চাঁদপানা মুখ ও মিষ্ট কথাগুলি মনে করিয়া, প্রফুল্লের দিকে অনেক টানিয়া বলিলেন। কিন্তু মন্ত্র তন্ত্র কিছুই খাটিল না। কর্ত্তার মুখ বৈশাখের মেঘের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এত বড় স্পর্দ্ধা! সেই বাগ্দী বেটী আমার বাড়ীতে ঢোকে ? এখনই ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি ! ছি ! অমন কথা কি বল্‌তে আছে—হাজার হোক্, বেটার বউ—আর বাগ্দীর মেয়ে বা কিরূপে হলো ? লোকে বল্‌লেই কি হয় ?"

গিন্নী ঠাকুরুণ হার কাত নিয়ে খেল্‌তে বসেছেন—কাজে কাজেই এই রকম বদ রঙ্গ চালাইতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। "বাগ্দী বেটীকে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।" এই হুকুমই বাহাল রহিল।

গিন্নী শেষে রাগ করিয়া বলিলেন, "ঝাঁটা মারিতে হয়, তুমি মার ; আমি আর তোমার ঘরকন্নার কথায় থাকিব না।" এই বলিয়া গিন্নী রাগে গর্ গর্ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যেখানে প্রফুল্লকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল সেখানে নাই।

প্রফুল্ল কোথায় গিয়াছে, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। একখানা কপাটের আড়াল হইতে ঘোমটা দিয়ে একটি চোদ্দ বছরের মেয়ে তাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল। প্রফুল্ল সেখানে গেল। প্রফুল্ল সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল বলিল, "দ্বার দিলে কেন ?"

মেয়েটি বলিল, "কেউ না আসে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কব, তাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "তোমার নাম কি ভাই ?"

সে বলিল, "আমার নাম সাগর, ভাই।"

প্র। তুমি কে, ভাই ?

সা। আমি, ভাই, তোমার সতীন।

প্র। তুমি আমায় চেন নাকি ?

সা। এই যে আমি কপাটের আড়াল থেকে সব শুনিলাম।

প্র। তবে তুমিই ঘরণী গৃহিণী—

সা। দূর, তা কেন ? পোড়া কপাল আর কি—আমি কেন সে হ'তে গেলেম ? আমার কি তেমনই দাঁত উঁচু, না আমি তত কালো ?

প্র। সে কি—কার দাঁত উঁচু ?

সা। কেন ? যে ঘরণী গৃহিণী।

প্র। সে আবার কে ?

সা। জান না ? তুমি কেমন ক'রেই বা জানবে ? কখন ত এসো নি, আমাদের আর এক সতীন আছে জান না ?

প্র। আমি ত আমি ছাড়া আর এক বিয়ের কথাই জানি—আমি মনে করিয়াছিলাম সেই তুমি।

সা। না। সে সেই,—আমার ত তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

প্র। সে বুঝি বড় কুৎসিত ?

সা। রূপ দেখে আমার কান্না পায় !

প্র। তাই বুঝি আবার তোমায় বিবাহ করেছে ?

সা। না, তা নয়। তোমাকে বলি, কারও সাক্ষাতে ব'লো না। (সাগর বড় চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল) আমার বাপের ঢের টাকা আছে। আমি বাপের এক সন্তান। তাই সেই টাকার জন্য—

প্র। বুঝেছি, আর বলিতে হবে না। তা তুমি সুন্দরী। যে কুৎসিত, সে ঘরণী গৃহিণী হলো কিসে ?

সা। আমি বাপের একটি সন্তান, আমাকে পাঠায় না ; আর আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের সঙ্গে বড় বনে না। তাই আমি এখানে কখন থাকি না। কাজে কর্ম্মে কখন আসে। এই দুই চারি দিন এসেছি, আবার শীঘ্র যাব।

প্রফুল্ল দেখিল যে, সাগর দিব্য মেয়ে—সতীন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না। প্রফুল্ল বলিল, "আমায় ডাক্‌লে কেন ?"

সা। তুমি কিছু খাবে ?

প্রফুল্ল হাসিল, বলিল, "কেন, এখন খাব কেন ?"

সা। তোমার মুখ শুক্‌নো, তুমি অনেক পথ এসেছ, তোমার তৃষ্ণা পেয়েছে। কেউ তোমায় কিছু খেতে বল্‌লেন না। তাই তোমাকে ডেকেছি।

প্রফুল্ল তখনও পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু উত্তর করিল, "শাশুড়ী গেছেন শ্বশুরের কাছে মন বুঝ্‌তে। আমার অদৃষ্টে কি হয়, তা না জেনে আমি এখানে কিছু খাব না। ঝাঁটা খেতে হয় ত তাই খাব, আর কিছু খাব না।"

সা। না না, এদের কিছু তোমার খেয়ে কাজ নাই। আমার বাপের বাড়ীর সন্দেশ আছে—বেশ সন্দেশ।

এই বলিয়া সাগর কতকগুলা সন্দেশ আনিয়া প্রফুল্লের মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। অগত্যা প্রফুল্ল কিছু খাইল। সাগর শীতল জল দিল, পান করিয়া প্রফুল্ল শরীর স্নিগ্ধ করিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমি শীতল হইলাম, কিন্তু আমার মা না খাইয়া মরিয়া যাইবে।"

সা। তোমার মা কোথায় গেলেন ?

প্র। কি জানি ? বোধ হয়, পথে দাঁড়াইয়া আছেন।

সা। এক কাজ কর্‌ব ?

প্র। কি ?

সা। ব্রহ্ম ঠানদিদিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব ?

প্র। তিনি কে ?

সা। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসী—এই সংসারে থাকেন।

প্র। তিনি কি কর্‌বেন ?

সা। তোমার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন।

প্র। মা এ বাড়ীতে কিছু খাবেন না।

সা। দূর! তাই কি বল্‌ছি? কোন বামুন-বাড়ীতে।

প্র। যা হয় কর, মার কষ্ট আর সহ্য হয় না।

সাগর চকিতের মত ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে যাইয়া সব বুঝাইয়া বলিল। ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিল, "মা, তাই ত! গৃহস্থবাড়ী উপবাসী থাকিবেন! অকল্যাণ হবে যে।" ব্রহ্ম প্রফুল্লের মার সন্ধানে বাহির হইল। সাগর ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লকে সংবাদ দিল। প্রফুল্ল বলিল, "এখন ভাই, যে গল্প করিতেছিলে, সেই গল্প কর।"

সা। গল্প আর কি? আমি ত এখানে থাকি না—থাক্‌তে পাবও না। আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মত—তাকে তোলা থাক্‌ব, দেবতার ভোগে কখন লাগিব না। তা, তুমি এয়েচ, যেমন করে পার, থাক। আমরা কেউ সেই কালপেঁচাটাকে দেখিতে পারি না।

প্র। থাক্‌ব বলেই ত এসেছি। থাক্‌তে পেলে ত হয়।

সা। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয়, তবে এখনই চলে যেও না।

প্র। না গিয়া কি করিব? আর কি জন্য থাকিব?—থাকি, যদি—

সা। যদি কি?

প্র। যদি তুমি আমার জন্ম সার্থক করাইতে পার।

সা। সে কিসে হবে ভাই?

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল, চক্ষে জল পড়িল। বলিল, "বুঝ নাই ভাই?"

সাগর তখন বুঝিল। একটু ভাবিয়া, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি সন্ধ্যার পর এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও। দিনের বেলা ত আর দেখা হবে না।"

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখিতেছি না। আমাদের গল্পের তারিখ এক শত বৎসর পূর্ব্বে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও যুবতীরা কখন দিনমানে স্বামিদর্শন পাইতেন না।

প্রফুল্ল বলিল, "কপালে কি হয়, তাহা আগে জানিয়া আসি। তার পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। কপালে যাই থাকে, একবার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। তিনি কি বলেন, শুনিয়া যাইব।"

এই বলিয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিল। দেখিল, তাহার শাশুড়ী তাহার তল্লাস করিতেছেন। প্রফুল্লকে দেখিয়া গিন্নী বলিলেন, "কোথা ছিলে মা?"

প্র। বাড়ী ঘর দেখিতেছিলাম।

গিন্নী। আহা! তোমারই বাড়ী ঘর, বাছা—তা কি কর্‌ব? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।

প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ীর বড় দয়া হইল। গিন্নী মনে মনে কল্পনা করিলেন—আর একবার নথনাড়া দিয়া দেখিব। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না—কেবল বলিলেন, "আজ আর কোথায় যাইবে? আজ এইখানে থাক। কাল সকালে যেও।"

প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া বলিল, "তা থাকিব—একটা কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাহাতে এক জন মানুষের এক বেলা আহার কুলায় না। জিজ্ঞাসা করিও—আমি কি করিয়া খাইব? আমি বাগদীই হই—মুচিই হই—তাঁহার পুত্রবধূ। তাঁহার পুত্রবধূ কি করিয়া দিনপাত করিবে?"

শাশুড়ী বলিল, "অবশ্য বলিব।" তার পর প্রফুল্ল উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর সেই ঘরে সাগর ও প্রফুল্ল, দুই জনে দ্বার বন্ধ করিয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া কপাটে ঘা দিল। সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "কে গো?"

"আমি গো।"

সাগর প্রফুল্লের গা টিপিয়া চুপি চুপি বলিল, "কথা ক'স্‌নে; সেই কালপেঁচাটা এসেছে।"

প্র। সতীন?

সা। হ্যাঁ—চুপ!

যে আসিয়াছিল, সে বলিল, "কে গা ঘরে, কথা ক'স্‌নে কেন? যেন সাগর বোয়ের গলা শুনিলাম না?"

সা। তুমি কে গা—যেন নাপিত বোয়ের গলা শুনিলাম না?

"আঃ মরণ আর কি! আমি কি নাপিত বোয়ের মতন?"

সা। কে তবে তুমি?

"তোর সতীন! সতীন! সতীন! নাম নয়ান বৌ।"

(বউটির নাম—নয়নতারা—লোকে তাহাকে "নয়ান বৌ" বলিত—সাগরকে "সাগর বৌ" বলিত।)

সাগর তখন কৃত্রিম ব্যস্ততার সহিত বলিল, "কে! দিদি! বালাই, তুমি কেন নাপিত বোয়ের মতন হতে যাবে? সে যে একটু ফরসা।"

নয়ন। মরণ আর কি—আমি কি তার চেয়েও কালো? তা সতীন এমনই বটে—তবু যদি চৌদ্দ বছরের না হতিস্!

সা। তা চৌদ্দ বছর হলো ত কি হলো—তুমি সতের—তোমার চেয়ে আমার রূপও আছে, যৌবনও আছে।

ন। রূপ যৌবন নিয়ে বাপের বাড়ীতে বসে বসে ধুয়ে খাস্। আমার যেমন মরণ নাই, তাই তোর কাছে কথা জিজ্ঞাসা করতে এলেম।

সা। কি কথা, দিদি?

ন। তুই দোরই খুল্‌লি নে, তার কথা কব কি? সন্ধ্যে রাত্রে দোর দিয়েছিস্ কেন্ লা?

সা। আমি ভাই লুকিয়ে দুটো সন্দেশ খাচ্চি। তুমি কি খাও না?

ন। তা খা খা। (নয়ন নিজে সন্দেশ বড় ভালবাসিত) বলি, জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, আবার একজন এয়েছে না কি?

সা। আবার একজন কি? স্বামী?

ন। মরণ আর কি! তাও কি হয়?

সা। হ'লে ভাল হতো—দুই জনে ভাগ করিয়া নিতাম। তোমার ভাগে নূতনটা দিতাম।

ন। ছি! ছি! ও সব কথা কি মুখে আনে?

সা। মনে?

ন। তুই আমায় যা ইচ্ছা তাই বলিবি কেন?

সা। তা ভাই, কি জিজ্ঞাসা করবে, না বুঝাইয়া বলিলে কেমন করিয়া উত্তর দিই?

ন। বলি, গিন্নীর না কি আর একটি বউ এয়েছে?

সা। কে বউ?

ন। সেই মুচি বউ।

সা। মুচি? কই, শুনি নে ত।

ন। মুচি, না হয় বাগ্দী?

সা। তাও শুনি নে।

ন। শোন নি—আমাদের এক জন বাগ্দী সতীন আছে।

সা। কই? না।

ন। তুই বড় দুষ্ট। সেই যে, প্রথম যে বিয়ে।

সা। সে ত বামনের মেয়ে।

ন। হ্যাঁ, বামনের মেয়ে! তা হলে আর নিয়ে ঘর করে না?

সা। কাল যদি তোমায় বিদায় দিয়ে, আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি বাগ্দীর মেয়ে হবে?

ন। তুই আমায় গাল দিবি কেন লা, পোড়ারমুখী?

সা। তুই আর এক জনকে গাল দিচ্ছিস্ কেন্ লা, পোড়ারমুখী?

ন। মর্‌গে যা—আমি ঠাকুরুণকে গিয়া বলিয়া দিই, তুই বড় মানুষের মেয়ে ব'লে আমায় যা ইচ্ছে তাই বলিস্।

এই বলিয়া নয়নতারা ওরফে কালপেঁচা ঝমর ঝমর করিয়া ফিরিয়া যায়—তখন সাগর দেখিল প্রমাদ! ডাকিল, "না দিদি, ফের ফের। ঘাট হয়েছে, দিদি, ফের! এই দোর খুলিতেছি।"

নয়নতারা রাগিয়াছিল—ফিরিবার বড় মত ছিল না। কিন্তু ঘরের ভিতর দ্বার দিয়া সাগর কত সন্দেশ খাইতেছে, ইহা দেখিবার একটু ইচ্ছা ছিল, তাই ফিরিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল—সন্দেশ নহে—আর এক জন লোক আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কে?"

সা। প্রফুল্ল।

ন। সে আবার কে?

সা। মুচি বৌ।

ন। এই সুন্দর?

সা। তোমার চেয়ে নয়।

ন। নে, আর জ্বালাস্ নে। তোর চেয়ে ত নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে কর্ত্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারীধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে? গৃহিণীর পাঁচ জন দাসী আছে—কিন্তু স্বামিসেবা—আর কার সাধ্য করিতে আসে! যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?

কর্ত্তা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগ্দী বেটী গিয়াছে কি?"

গৃহিণী মাছি তাড়াইয়া নথ নাড়িয়া বলিলেন, "রাত্রে আবার সে কোথা যাবে? রাত্রে একটা অতিথ এলে তুমি তাড়াও না—আর আমি বৌটোকে রাত্রে তাড়িয়ে দেব?"

কর্ত্তা। অতিথ হয়, অতিথশালায় যাক্ না? এখানে কেন?

গিন্নী। আমি তাড়াতে পার্‌ব না, আমি ত বলেছি। তাড়াতে হয়, তুমি তাড়াও। বড় সুন্দর বৌ কিন্তু—

কর্ত্তা। বাগ্দীর ঘরে অমন ছুটো একটা সুন্দর হয়। তা আমি তাড়াচ্চি। ব্রজকে ডাক্ ত রে।

ব্রজ, কর্ত্তার ছেলের নাম। এক জন চাকরাণী ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ব্রজশ্বরের বয়স একুশ বাইশ; অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ,—পিতার কাছে বিনীত ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল—কথা কহিতে সাহস নাই।

দেখিয়া হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু, তোমার তিন সংসার মনে আছে?"

ব্রজ চুপ করিয়া রহিল।

"প্রথম বিবাহ-মনে হয়—সে একটা বাগ্দীর মেয়ে?"

ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে।

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, "সে বাগ্দী বেটী—আজ এখানে এসেছে—জোর ক'রে থাক্‌বে, তা তোমার গর্ভধারিণীকে বল্‌লেম যে, ঝাঁটা মেরে তাড়াও। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে? এ তোমার কাজ। তোমারই অধিকার—আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আজ রাত্রে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াইয়া দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি! বাবা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল না। ওঁর কথা রাখিতেই হইবে, আমার কথা কিছু চল্‌বে না? তা যা কর, ভাল কথায় বিদায় করিও।"

ব্রজ বাপের কথায় উত্তর দিল, "যে আজ্ঞা।" মার কথায় উত্তর দিল, "ভাল।"

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর একটু দাঁড়াইল। সেই অবকাশে গৃহিণী কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বৌকে তাড়াবে—বৌ খাবে কি করিয়া?"

কর্ত্তা বলিলেন, "যা খুসি করুক—চুরি করুক, ডাকাতি করুক—ভিক্ষা করুক।"

গৃহিণী ব্রজেশ্বরকে বলিয়া দিলেন, "তাড়াইবার সময়ে বৌমাকে এই কথা বলিও। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

ব্রজেশ্বর পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর নিকুঞ্জে গিয়া দর্শন দিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মঠাকুরাণী তদ্গতচিত্তে মালা জপ করিতেছেন, আর মশা তাড়াইতেছেন। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "ঠাকুরমা!"

ব্রহ্ম। কেন, ভাই?

ব্রজ। আজ না কি নূতন খবর?

ব্রহ্ম। কি নূতন? সাগর আমার চরকাটা ভেঙ্গে দিয়েছে তাই? তা ছেলেমানুষ, দিয়েছে দিয়েছে। চরকা কাট্‌তে তার সাধ গিয়েছিল—

ব্রজ। তা নয় তা নয়—বলি আজ না কি—

ব্রহ্ম। সাগরকে কিছু বলিও না। তোমরা বেঁচে থাক, আমার কত চরকা হবে। তবে বুড়ো মানুষ—

ব্রজ। বলি আমার কথাটা শুন্‌বে?

ব্রহ্ম। বুড়ো মানুষ, কবে আছি কবে নেই, দুটো পৈতে তুলে বামুনকে দিই বই ত নয়। তা যাক্ গে—

ব্রজ। আমার কথাটা শোন, নইলে তোমার যত চরকা হবে, সব আমিই ভেঙ্গে দেব।

ব্রহ্ম। কি বল্‌ছ? চরকার কথা নয়?

ব্রজ। তা নয়—আমার দুইটি ব্রাহ্মণী আছে জান ত?

ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণী? মা মা মা! যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর বৌ—আমার হাড়টা খেলে—কেবল রূপকথা বল—রূপকথা বল—রূপকথা বল! ভাই, এত রূপকথা পাব কোথা?

ব্রজ। রূপকথা থাক্—

ব্রহ্ম। তুমি যেন বল্‌লে থাক্, তারা ছাড়ে কই? শেষে সেই বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা বলিলাম। বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা জান? বলি শোন। এক বনে বড় একটা শিমুলগাছে এক বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী থাকে—

ব্রজ। সর্ব্বনাশ! ঠাকুরমা, কর কি? এখন রূপকথা! আমার কথা শোন।

ব্রহ্ম। তোমার আবার কথা কি? আমি বলি, রূপকথা শুনিতেই এয়েছ—তোমাদের ত আর কাজ নাই?

ব্রজেশ্বর মনে মনে ভাবিল, "কবে বুড়ীদের ৮ প্রাপ্তি হবে।" প্রকাশ্যে বলিল, "আমার তুইটি ব্রাহ্মণী—আর একটি বাগ্দিনী। বাগ্দিনীটি না কি আজ এয়েছে?"

ব্রহ্ম। বালাই বালাই—বাগ্দিনী কেন? সে বামনের মেয়ে।

ব্রজ। এয়েছে?

ব্রহ্ম। হাঁ।

ব্রজ। কোথায়? একবার দেখা হয় না?

ব্রহ্ম। হাঁ। আমি দেখা করিয়ে দিয়ে তোমার বাপ মার ছু চক্ষের বিষ হই! তার চেয়ে বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা শোন।

ব্রজ। ভয় নাই—বাপ মা আমাকে ডাকাইয়া বলিয়াছেন—তাকে তাড়াইয়া দাও। তা দেখা না পেলে, তাড়াইয়া দিব কি প্রকারে? তুমি ঠাকুরমা, তোমার কাছে সন্ধানের জন্য আসিয়াছি।

ব্রহ্ম। ভাই, আমি বুড়ো মানুষ—কৃষ্ণনাম জপ করি, আর আলো চাল খাই; রূপকথা শোন ত বল্‌তে পারি। বাগ্দীর কথাতেও নাই, বামনীর কথাতেও নাই।

ব্রজ। হায়! বুড়ো বয়সে কবে তুমি ডাকাতের হাতে পড়িবে!

ব্রহ্ম। অমন কথা বলিস্ নে—বড় ডাকাতের ভয়! কি, দেখা কর্‌বি?

ব্রজ। তা নহিলে কি তোমার মালাজপা দেখ্‌তে এসেছি?

ব্রহ্ম। সাগর বৌয়ের কাছে যা।

ব্রজ। সতীনে কি সতীনকে দেখায়?

ব্রহ্ম। তুই যা না। সাগর তোকে ডেকেছে, ঘরে গিয়ে বসে আছে। অমন মেয়ে আর হয় না।

ব্রজ। চরকা ভেঙ্গেছে ব'লে? নয়ানকে বলে দেব—সে যেন একটা চরকা ভেঙ্গে দেয়।

ব্রহ্ম। হাঁ—সাগরে, আর নয়ানে! যা যা!

ব্রজ। গেলে বাগ্দিনী দেখ্‌তে পাব?

ব্রহ্ম। বুড়ীর কথাটাই শোন্ না; কি জ্বালাতেই পড়্‌লেম গা? আমার মালা জপা হলো না। তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক্—আর চুয়াত্তর বছরই হোক্—কই, কেউ ডাক্‌লে ত কখন 'না' বলিত না।

ব্রজ। ঠাকুরদাদার অক্ষয় স্বর্গ হৌক্—আমি চৌদ্দ বছরের সন্ধানে চলিলাম। ফিরিয়া আসিয়া চুয়াত্তর বছরের সন্ধান লইব কি?

ব্রহ্ম। যা যা যা! আমার মালা জপা ঘুরে গেল। আমি নয়নতারাকে বলে দিব, তুই বড় চেঙ্গড়া হয়েছিস্।

ব্রজ। ব'লে দিও। খুসী হ'য়ে দুটো ছোলাভাজা পাঠিয়ে দেবে।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর সাগরের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দুইটি ঘর পাইয়াছিল, একটি নীচে, একটি উপরে।

নীচের ঘরে বসিয়া সাগর পান সাজিত, সমবয়স্কদিগের সঙ্গে খেলা করিত, কি গল্প করিত। উপরের ঘরে রাত্রে শুইত; দিনমানে নিদ্রা আসিলে সেই ঘরে গিয়া দ্বার দিত। অতএব ব্রজেশ্বর, ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপকথার জ্বালা এড়াইয়া সেই উপরের ঘরে গেলেন।

সেখানে সাগর নাই—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আর এক জন কে আছে। অনুভবে বুঝিলেন, এই সেই প্রথম স্ত্রী।

বড় গোল বাধিল। দুই জনে সম্বন্ধ বড় নিকট—স্ত্রী পুরুষ—পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু কখনও দেখা নাই। কখনও কথা নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে? কে আগে কথা কহিবে? বিশেষ এক জন তাড়াইতে আসিয়াছে, আর এক জন তাড়া খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রাচীনা পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কথাটা কি রকমে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল?

উচিত যাই হউক—উচিতমত কিছুই হইল না। প্রথমে দুই জনের একজনও

অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষে প্রফুল্ল অল্প, অল্পমাত্র হাসিয়া, গলায় কাপড় দিয়া ব্রজেশ্বরের পায়ের গোড়ায় আসিয়া ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল।

ব্রজেশ্বর বাপের মত নহে। প্রণাম গ্রহণ করিয়া অপ্রতিভ হইয়া বাহু ধরিয়া প্রফুল্লকে উঠাইয়া পালঙ্কে বসাইল। বসাইয়া আপনি কাছে বসিল।

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ একাল! তা সে ঘোমটাটুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে সরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিল যে, প্রফুল্ল কাঁদিতেছে। ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া—আ ছি! ছি! ছি! বাইশ বছর বয়সেই ধিক্! ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া, না ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় ডব্‌ডবে চোকের নীচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে—আ! ছি! ছি!—ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বন করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি, মার্জ্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।

যখন ব্রজেশ্বর এই ঘোরতর অশ্লীলতা-দোষে নিজে দূষিত হইতেছিলেন, এবং গ্রন্থকারকে সেই দোষে দূষিত করিবার কারণ হইতেছিলেন—যখন নির্ব্বোধ প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিতেছিল যে, বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই, সেই সময়ে দ্বারে কে মুখ বাড়াইল। মুখখানা বুঝি অল্প একটু হাসিয়াছিল—কি যার মুখ, তার হাতের গহনার বুঝি একটু শব্দ হইয়াছিল—তাই ব্রজেশ্বরের কান সে দিকে গেল। ব্রজেশ্বর সে দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মুখখানা বড় সুন্দর। কালো কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাপটায় বেড়া—তখন মেয়েরা ঝাপটা রাখিত—তার উপর একটু ঘোমটা টানা—ঘোমটার ভিতর দুইটা পদ্ম-পলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট মিঠে মিঠে হাসিতেছে। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, মুখখানা সাগরের। সাগর, স্বামীকে একটা চাবি ও কুলুপ দেখাইল। সাগর ছেলেমানুষ; স্বামীর সঙ্গে জিয়াদা কথা কয় না। ব্রজ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বুঝিতে বড় বিলম্বও হইল না। সাগর বাহির হইতে কপাট টানিয়া দিয়া, শিকল লাগাইয়া, কুলুপে চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া, দুড়্ দুড়্ করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজেশ্বর, কুলুপ পড়িল শুনিতে পাইয়া, "কি কর, সাগর! কি কর, সাগর!" বলিয়া চেঁচাইল। সাগর কিছুতেই কান না দিয়া দুড়্ দুড়্ ঝম্ ঝম্ করিয়া ছুটিয়া একেবারে ব্রহ্মঠাকুরাণীর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিলেন, "কি লা সাগর বৌ? কি হয়েছে? এখানে এসে শুলি যে?"

সাগর কথা কয় না।

ব্রহ্ম। তোকে ব্রজ তাড়িয়ে দিয়েছে না কি ?

সা। তা নইলে আর তোমার আশ্রমে আসি ? আজ তোমার কাছে শোব।

ব্রহ্ম। তা শো শো! এখনই আবার ডাকৃবে এখন! আহা! তোর ঠাকুরদাদা এমন বার মাস ত্রিশ দিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার তখনই ডেকেছে—আমি আরও রাগ করে যেতাম না—তা মেয়েমানুষের প্রাণ ভাই! থাকতেও পারিতাম না। এক দিন হলো কি—

সা। ঠান্‌দিদি, একটা রূপকথা বল না।

ব্র। কোন্‌টা বল্‌বো, বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর কথা বল্‌বো ? এক্‌লা শুন্‌বি, তা নূতন বৌটা কোথায় ? তাকে ডাক্ না—দুজনে শুন্‌বি।

সা। সে কোথা, আমি এখন খুঁজিতে পারি না। আমি একাই শুন্‌বো। তুমি বল।

ব্রহ্মঠাকুরাণী তখন সাগরের কাছে শুইয়া বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিলেন। সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরাণী সে সংবাদ অনবগত, দুই চারি দণ্ড গল্প চালাইলেন; পরে যখন জানিতে পারিলেন, শ্রোত্রী নিদ্রামগ্না, তখন দুঃখিতচিত্তে মাঝখানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই সাগর আসিয়া, ঘরের কুলুপ খুলিয়া দিয়া গেল। তার পর কাহাকে কিছু না বলিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর ভাঙ্গা চরকা লইয়া, সেই নিদ্রামগ্না বর্ষীয়সীর কানের কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিল।

"কটাশ—ঝনাৎ" করিয়া কুলুপ শিকল খোলার শব্দ হইল—প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল। প্রফুল্ল বসিয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "সাগর শিকল খুলিয়াছে, আমি চলিলাম। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার কর না কর, দাসী বলিয়া মনে রাখিও।"

ব্র। এখন যাইও না। আমি একবার কর্ত্তাকে বলিয়া দেখিব।

প্র। বলিলে কি তাঁর মন ফিরিবে ?

ব্র। না ফিরুক, আমার কাজ আমায় করিতে হইবে। অকারণে তোমায় ত্যাগ করিয়া, আমি কি অধর্ম্মে পতিত হইব ?

প্র। তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই—গ্রহণ করিয়াছ। আমাকে এক দিনের জন্য শয্যার পাশে ঠাঁই দিয়াছ—আমার সেই ঢের। তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না। তাতে আমি সুখী হইব না।

ব্র। নিতান্ত পক্ষে, তিনি যাহাতে তোমার খোরপোষ পাঠাইয়া দেন, তা আমায় করিতে হইবে।

প্র। তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা লইব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা লইব।

ব্র। আমার কিছুই নাই, কেবল আমার এই আঙ্গটিটি আছে। এখন এইটি লইয়া যাও। আপাততঃ ইহার মূল্যে কতক দুঃখ নিবারণ হইবে। তার পর যাহাতে আমি দু পয়সা রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণ পোষণ করিব।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনার অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লকে দিল। প্রফুল্ল আপনার আঙুলে আঙ্গটিটি পরাইতে পরাইতে বলিল, "যদি তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও?"

ব্র। সকলকে ভুলিব—তোমায় কখন ভুলিব না।

প্র। যদি এর পর চিনিতে না পার?

ব্র। ও মুখ কখনও ভুলিব না।

প্র। আমি এ আঙ্গটিটি বেচিব না। না খাইয়া মরিয়া যাইব, তবু কখন বেচিব না। যখন তুমি আমাকে না চিনিতে পারিবে, তখন তোমাকে এই আঙ্গটি দেখাইব। ইহাতে কি লেখা আছে?

ব্র। আমার নাম খোদা আছে।

দুই জনে অশ্রুজলে নিষিক্ত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিলে সাগর ও নয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পোড়ারমুখী নয়ান বলিল, "দিদি, কাল রাত্রে কোথায় শুইয়াছিলি?"

প্র। ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে কথা আপনার মুখে বলে না।

ন। সে আবার কি?

সাগর। বুঝ্‌তে পারিস্‌ নে? কাল উনি আমাকে তাড়াইয়া আমার পালঙ্কে, বিষ্ণুর লক্ষ্মী হইয়াছিলেন। মিন্সে আবার সোহাগ ক'রে আঙ্গটি দিয়েছে।

সাগর নয়ানকে প্রফুল্লের হাতে ব্রজেশ্বরের আঙ্গটি দেখাইল। দেখিয়া নয়নতারা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল। বলিল, "দিদি, ঠাকুর তোমার কথার কি উত্তর দিয়াছেন, শুনেছ?"

প্রফুল্লের সে কথা আর মনে ছিল না, সে ব্রজেশ্বরের আদর পাইয়াছিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথার উত্তর?"

ন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কি করিয়া খাইবে?

প্র। তার আর উত্তর কি?

ন। ঠাকুর বলিয়াছেন, চুরি ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিও।

"দেখা যাবে" বলিয়া প্রফুল্ল বিদায় হইল।

প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। একেবারে বাহিরে খিড়কীদ্বার পার হইল। সাগর পিছু পিছু গেল। প্রফুল্ল তাহাকে বলিল, "আমি, ভাই, আজ চলিলাম। এ বাড়ীতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ী গেলে, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী চেন?

প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী যাবে?

প্র। আমার আর লজ্জা কি?

সা। তোমার মা তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফুল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখাইয়া দিল। প্রফুল্ল মার কাছে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মা বাড়ী আসিল। প্রফুল্লের মার যাতায়াতে বড় শারীরিক কষ্ট গিয়াছে—মানসিক কষ্ট ততোধিক। সকল সময় সব সয় না। ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লের মা জ্বরে পড়িল। প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, বামনের ঘরের মেয়ে—তাতে বিধবা, প্রফুল্লের মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না। তারই উপর দুবেলা স্নান, জুটিলে আহার, পূর্ব্বমত চলিল। প্রতিবাসীরা দয়া করিয়া কখনও কিছু দিত, তাইতে আহার চলিত। ক্রমে জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইল—শেষে প্রফুল্লের মা শয্যাগত হইল। সেকালে সেই সকল গ্রাম্য প্রদেশে চিকিৎসাপত্র বড় ছিল না—বিধবারা প্রায়ই ঔষধ খাইত না—বিশেষ প্রফুল্লের এমন লোক নাই যে, কবিরাজ ডাকে। কবিরাজও দেশে না থাকারই মধ্যে। জ্বর বাড়িল—বিকার প্রাপ্ত হইল, শেষে প্রফুল্লের মা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন।

পাড়ার পাঁচ জন, যাহারা তাহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লের মার সৎকার করিল। বাঙ্গালীরা এ সময় শত্রুতা রাখে না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে।

প্রফুল্ল একা। পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া বলিল, "তোমাকে চতুর্থের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" প্রফুল্ল বলিল, "ইচ্ছা, পিণ্ডদান করি—কিন্তু কোথায় কি পাইব?" পাড়ার পাঁচ জন বলিল, "তোমায় কিছু করিতে হইবে না—আমরা সব করিয়া লইতেছি।" কেহ কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামগ্রী দিল, এইরূপ করিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের উদ্যোগ হইল। প্রতিবাসীরা আপনারাই সকল উদ্যোগ করিয়া লইল।

একজন প্রতিবাসী বলিল, "একটা কথা মনে হইতেছে। তোমার মার শ্রাদ্ধে তোমার শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কি না?"

প্রফুল্ল বলিল, "কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে?"

দুই জন পাড়ার মাতব্বর লোক অগ্রসর হইল। সকল কাজে তাহারাই আগু হয়—তাদের সেই রোগ। প্রফুল্ল বলিল, "তোমরাই আমাদের কলঙ্ক রটাইয়া সে ঘর ঘুচাইয়াছ।"

তাহারা বলিল, "সে কথা আর মনে করিও না। আমরা সে কথা সারিয়া লইব। তুমি এখন অনাথা বালিকা—তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোন বিবাদ নাই।"

প্রফুল্ল সম্মত হইল। দুই জন হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। হরবল্লভ বলিলেন, "কি ঠাকুর! তোমরাই বিহাইনকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া তাকে একঘ'রে ক'রেছিলে—আবার তোমাদেরই মুখে এই কথা?"

ব্রাহ্মণেরা বলিল, "সে কি জানেন—অমন পাড়াপড়সীতে গোলযোগ হয়—সেটা কোন কাজের কথা নয়।"

হরবল্লভ বিষয়ী লোক—ভাবিলেন, "এ সব জুয়াচুরি। এ বেটারা বাগ্দী বেটীর কাছে টাকা খাইয়াছে। ভাল, বাগ্দী বেটী টাকা পাইল কোথা?" অতএব হরবল্লভ নিমন্ত্রণের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্লের প্রতি বরং আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর এ সকল শুনিল। মনে করিল, "এক দিন রাত্রে লুকাইয়া গিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিব। সেই রাত্রেই ফিরিব।"

প্রতিবাসীরা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল যথারীতি মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন সম্পন্ন করিল। ব্রজেশ্বর যাইবার সময় খুঁজিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলমণি নাপিতানীর বাস প্রফুল্লের বাসের নিকট। মাতৃহীন হইয়া অবধি প্রফুল্ল একা গৃহে বাস করে। প্রফুল্ল সুন্দরী, যুবতী, রাত্রে একা বাস করে, তাহাতে ভয়ও আছে, কলঙ্ক আছে। কাছে শুইবার জন্য রাত্রে এক জন স্ত্রীলোক চাই। ফুলমণিকে এ জন্য প্রফুল্ল অনুরোধ করিয়াছিল। ফুলমণি বিধবা ; তার এক বিধবা ভগিনী ভিন্ন কেহ নাই। আর তারা দুই ব'নেই প্রফুল্লের মার অনুগত ছিল। এই জন্য প্রফুল্ল ফুলমণিকে অনুরোধ করে, আর ফুলমণিও সহজে স্বীকার করে। অতএব যে দিন প্রফুল্লের মা মরিয়াছিল, সেই দিন অবধি প্রফুল্লের বাড়ীতে ফুলমণি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া শোয়।

তবে ফুলমণি কি চরিত্রের লোক, তাহা ছেলেমানুষ প্রফুল্ল সবিশেষ জানিত না। ফুলমণি প্রফুল্লের অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, বেশ-ভূষায় একটু পারিপাট্য রাখিত। একে ইতর জাতির মেয়ে, তাতে বালবিধবা ; চরিত্রটা বড় সে খাঁটি রাখিতে পারে নাই। গ্রামের জমিদার পরাণ চৌধুরী। তাঁহার একজন গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামে আসিয়া মধ্যে মধ্যে কাছারি করিত। লোকে বলিত, ফুলমণি দুর্লভের বিশেষ অনুগৃহীতা—অথবা দুর্লভ তাহার অনুগৃহীত। এ সকল কথা প্রফুল্ল একেবারে যে কখনও শুনে নাই—তা নয়, কিন্তু কি করে—আর কেহ আপনার ঘর দ্বার ফেলিয়া প্রফুল্লের কাছে আসিয়া শুইতে চাহে না। বিশেষ প্রফুল্ল মনে করিল, "সে মন্দ হোক, আমি না মন্দ হইলে আমায় কে মন্দ করিবে ?"

অতএব ফুলমণি দুই চারি দিন আসিয়া প্রফুল্লের ঘরে শুইল। শ্রাদ্ধের পরদিন ফুলমণি একটু দেরি করিয়া আসিতেছিল। পথে একটা আমগাছের তলায়, একটা বন আছে, আসিবার সময় ফুলমণি সেই বনে প্রবেশ করিল। সে বনের ভিতর এক জন পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সে সেই দুর্লভচন্দ্র।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃতাভিসারা, তাম্বূলরাগরক্তাধরা, রাঙ্গাপেড়ে শাড়ীপড়া, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া বলিলেন, "কেমন, আজ ?"

ফুলমণি বলিলেন, "হাঁ, আজই বেশ। তুমি রাত্রি দুপরের সময় পাল্কী নিয়ে এসো—দুয়ারে টোকা মেরো। আমি দুয়ার খুলিয়া দিব। কিন্তু দেখো, গোল না হয়।"

দুর্লভ। তার ভয় নাই। কিন্তু সে ত গোল করবে না ?

ফুলমণি। তার একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। আমি আস্তে আস্তে দোরটি খুল্‌ব, তুমি আস্তে আস্তে, সে ঘুমিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার মুখটি কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। তার পর চেঁচায় কার বাপের সাধ্য!

দুর্লভ। তা, অমন জোর করে নিয়ে গেলে কয় দিন থাকিবে?

ফুল। একবার নিয়ে যেতে পার্‌লেই হলো। যার তিন কুলে কেউ নেই, যে অন্নের কাঙ্গাল, সে খেতে পাবে, কাপড় পাবে, গয়না পাবে, টাকা পাবে, সোহাগ পাবে—সে আবার থাক্‌বে না? সে ভার আমার—আমি যেন গয়না টাকার ভাগ পাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে, দুর্লভ স্বস্থানে গেল—ফুলমণি প্রফুল্লের কাছে গেল। প্রফুল্ল এ সর্ব্বনাশের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। সে মার কথা ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিল। মার জন্য যেমন কাঁদে, তেমনি কাঁদিল; কাঁদিয়া যেমন রোজ ঘুমায়, তেমনি ঘুমাইল। দুই প্রহরে দুর্লভ আসিয়া দ্বারে টোকা মারিল। ফুলমণি দ্বার খুলিল। দুর্লভ প্রফুল্লের মুখ বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিল। বাহকেরা নিঃশব্দে তাহাকে পরাণবাবু জমিদারের বিহার মন্দিরে লইয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ইহার অর্দ্ধ দণ্ড পরে ব্রজেশ্বর সেই শূন্য গৃহে প্রফুল্লের সন্ধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজেশ্বর সকলকে লুকাইয়া রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে। হায়! কোথাও কেহ নাই।

প্রফুল্লকে লইয়া বাহকেরা নিঃশব্দে চলিল বলিয়াছি; কেহ মনে না করেন—এটা ভ্রম-প্রমাদ! বাহকের প্রকৃতি শব্দ করা। কিন্তু এবার শব্দ করার পক্ষে তাহাদের প্রতি নিষেধ ছিল। শব্দ করিলে গোলযোগ হইবে; তা ছাড়া আর একটা কথা ছিল। ব্রহ্ম-ঠাকুরাণীর মুখে শুনা গিয়াছে, বড় ডাকাতের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যুভীতি কখনও কোন দেশে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তার পর আবার দেবী সিংহের ইজারা। পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্ট্‌ মিনিষ্টর হলে দাঁড়াইয়া এদ্‌মন্দ্‌ বর্ক্‌ সেই দেবী সিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক্‌, দেবী সিংহের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার অনন্ত কালসমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর লোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্র-ভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত

বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে? গুড্‌ল্যাড্ সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।

অতএব দুর্লভের ভয়, তিনি ডাকাতি করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া যাইতেছেন, আবার তার উপর ডাকাতে না ডাকাতি করে। পাল্কী দেখিয়া ডাকাতের আসা সম্ভব। সেই ভয়ে বেহারারা নিঃশব্দ। গোলমাল হইবে বলিয়া সঙ্গে আর অপর লোক জনও নাই, কেবল দুর্লভ নিজে আর ফুলমণি। এইরূপে তাহারা ভয়ে ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল।

তার পর ভারি জঙ্গল আরম্ভ হইল। বেহারারা সভয়ে দেখিল, দুই জন মানুষ সম্মুখে আসিতেছে। রাত্রিকাল—কেবল নক্ষত্রালোকে পথ দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেহারারা দেখিল, যেন কালান্তক যমের মত দুই মূর্ত্তি আসিতেছে। এক জন বেহারা অপরদিগকে বলিল, "মানুষ দুটোকে সন্দেহ হয়!" অপর আর এক জন বলিল, "রাত্রে যখন বেড়াচ্চে, তখন কি আর ভাল মানুষ?"

তৃতীয় বাহক বলিল, "মানুষ দুটো ভারি জোয়ান।"

৪র্থ। হাতে লাঠি দেখ্‌ছি না?

১ম। চক্রবর্ত্তী মশাই কি বলেন? আর তো এগোনো যায় না—ডাকাতের হাতে প্রাণটা যাবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তাই ত, বড় বিপদ্ দেখি যে! যা ভেবেছিলেম, তাই হলো!"

এমন সময়ে, যে দুই ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহারা পথে লোক দেখিয়া হাঁকিল, "কোন্ হ্যায় রে?"

বেহারারা অমনি পাল্কী মাটিতে ফেলিয়া দিয়া "বাবা গো" শব্দ করিয়া একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল। দেখিয়া দুর্লভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেই পথাবলম্বী হইলেন। তখন ফুলমণি "আমায় ফেলে কোথা যাও?" বলিয়া তাঁর পাছু পাছু ছুটিল।

যে দুই জন আসিতেছিল—যাহারা এই দশ জন মনুষ্যের ভয়ের কারণ—তাহারা পথিক মাত্র। দুই জন হিন্দুস্থানী দিনাজপুরের রাজসরকারে চাকরীর চেষ্টায় যাইতেছে। রাত্রিপ্রভাত নিকট দেখিয়া সকালে সকালে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেহারারা পলাইল

দেখিয়া তাহারা একবার খুব হাসিল। তাহার পর আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আর ফুলমণি ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

প্রফুল্ল পাল্কীতে উঠিয়াই মুখের বাঁধন স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরে চীৎকার করিয়া কি হইবে বলিয়া চীৎকার করে নাই; চীৎকার শুনিতে পাইলেই বা কে ডাকাতের সম্মুখে আসিবে! প্রথমে ভয়ে প্রফুল্ল কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। যখন বেহারারা পাল্কী ফেলিয়া পলাইল, তখন প্রফুল্ল বুঝিল—আর একটা কি নূতন বিপদ্। ধীরে ধীরে পাল্কীর কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল, দুই জন মনুষ্য আসিতেছে। তখন প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিল; যে অল্প ফাঁক রহিল, তাহা দিয়া প্রফুল্ল দেখিল, মনুষ্য দুই জন চলিয়া গেল। তখন প্রফুল্ল পাল্কী হইতে বাহির হইল—দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

প্রফুল্ল ভাবিল, যাহারা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা অবশ্য ফিরিবে। অতএব যদি পথ ধরিয়া যাই, তবে ধরা পড়িতে পারি। তার চেয়ে এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকি। তার পর, দিন হইলে যা হয় করিব।

এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। ভাগ্যক্রমে যে দিকে বেহারারা পলাইয়াছিল, সে দিকে যায় নাই। সুতরাং কাহারও সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল না। প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই প্রভাত হইল।

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে লাগিল। পথে বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল, এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে। যখন পথের রেখা এদিকে গিয়াছে, তখন অবশ্য এদিকে মানুষের বাস আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ী হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ধরিয়া আনে। বাঘ ভালুকে খায়, সেও ভাল, আর ডাকাইতের হাতে না পড়িতে হয়।

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল—বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল—আর পথ পায় না। কিন্তু দুই একখানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল, যদি ইট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয় আছে।

যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। জঙ্গল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। শেষে প্রফুল্ল দেখিল, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রফুল্ল

ইষ্টকস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, এখনও দুই চারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল, সকল ঘরের দ্বার খোলা—মনুষ্য নাই। অথচ মনুষ্য-বাসের চিহ্নও কিছু কিছু আছে। ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোন বুড়া মানুষের কাতরানি শুনিতে পাইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরীমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেখানে এক বুড়া শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষু কোটরগত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "মা, তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমি অনাথা। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমিও দেখিতেছি অনাথ—তোমার কোন উপকার করিতে পারি?"

বুড়া বলিল, "অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার। জয় নন্দদুলাল! এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম। পিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল দাও।"

প্রফুল্ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জল-কলসী আছে, কলসীতে জল আছে; জলপাত্র আছে। কেবল দিবার লোক নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে খাওয়াইল।

বুড়া জল পান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। প্রফুল্ল এই অরণ্যমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থায় দেখিয়া বড় কৌতূহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন অধিক কথা কহিতে পারে না। প্রফুল্ল সুতরাং তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইল না। বুড়া যে কয়টি কথা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই;—

বুড়া বৈষ্ণব। তাহার কেহ নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল। বৈষ্ণবী বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্যসামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে। বুড়া বৈষ্ণব—তাহার দাহ হইবে না। বুড়ার কবর হয়—এই ইচ্ছা। বুড়ার কথামত, বৈষ্ণবী বাড়ীর উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছে। হয়ত শাবল কোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে। বুড়া এখন প্রফুল্লের কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে, "আমি মরিলে সেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিও।"

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। তার পর বুড়া বলিতে লাগিল, "আমার কিছু টাকা পোঁতা আছে। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না—তাহা হইলে, না লইয়া পালাইত না। সে টাকাগুলি কাহাকে না দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির হইবে না। যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে

যক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইব—আমার গতি হইবে না। বৈষ্ণবীকে সেই টাকা দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ত পলাইয়াছে। আর কোন্ মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইব? তাই তোমাকেই সেই টাকাগুলি দিয়া যাইতেছি। আমার বিছানার নীচে একখানা চৌকা তক্তা পাতা আছে। সেই তক্তাখানি তুলিবে। একটা সুরঙ্গ দেখিতে পাইবে। বরাবর সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া নামিবে—ভয় নাই—আলো লইয়া যাইবে। নীচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সে ঘরের বায়ুকোণে খুঁজিও—টাকা পাইবে।"

প্রফুল্ল বুড়ার শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিল। বুড়া বলিল, "এই বাড়ীতে গোহাল আছে—গোহালে গরু আছে। গোহাল হইতে যদি দুধ দুইয়া আনিতে পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দাও, একটু আপনি খাও।"

প্রফুল্ল তাহাই করিল—দুধ আনিবার সময় দেখিয়া আসিল—কবর কাটা—সেখানে কোদালি শাবল পড়িয়া আছে।

অপরাহ্ণে বুড়ার প্রাণবিয়োগ হইল। প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল—বুড়া শীর্ণকায়; সুতরাং লঘু; প্রফুল্লের বল যথেষ্ট! প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়া, কবরে শুয়াইয়া মাটি চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কূপে স্নান করিয়া ভিজা কাপড় আধখানা পরিয়া রৌদ্রে শুকাইল। তার পরে কোদালি শাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে চলিল। বুড়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে—সুতরাং লইতে কোন বাধা আছে, মনে করিল না। প্রফুল্ল দীন-দুঃখিনী।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্ব্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল—দেখিয়াছিল যে, শয্যার নীচে যথার্থই একখানি চৌকা তক্তা, দীর্ঘে প্রস্থে তিন হাত হইবে, মেঝেতে বসান আছে। এখন শাবল আনিয়া, তাহার চাড়ে তক্তা উঠাইল—অন্ধকার গহ্বর দেখা দিল। ক্রমে অন্ধকারে প্রফুল্ল দেখিল, নামিবার একটা সিঁড়ি আছে বটে।

জঙ্গলে কাঠের অভাব নাই। কিছু কাঠের চেলা উঠানে পড়িয়াছিল। প্রফুল্ল তাহা বহিয়া আনিয়া কতকগুলা গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর অনুসন্ধান করিতে লাগিল—চক্‌মকি দিয়াশলাই আছে কি না। বুড়া মানুষ—অবশ্য তামাকু খাইত। সর্ ওয়াল্টর রালের আবিষ্ক্রিয়ার পর, কোন্ বুড়া তামাকু ব্যতীত এ ছার, এ নশ্বর, এ নীরস,

এ দুর্ব্বিষহ জীবন শেষ করিতে পারিয়াছে ?—আমি গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভাল হয় নাই—তার আর কিছু দিন থাকিয়া এই পৃথিবীর দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করাই উচিত ছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রফুল্ল চকমকি, সোলা, দিয়াশলাই, সব পাইল। তখন প্রফুল্ল গোহাল উচাইয়া বিচালি লইয়া আসিল। চকমকির আগুনে বিচালি জ্বালিয়া সেই সরু সিঁড়িতে পাতালে নামিল। শাবল কোদালি আগে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল। দেখিল, দিব্য একটি ঘর। বায়ুকোণ—বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। তার পর যে সব কাঠ ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা বিচালির আগুনে জ্বালিল। উপরে মুক্ত পথ দিয়া ধুঁয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ঘর আলো হইল। সেইখানে প্রফুল্ল খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে "ঠং" করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল, ঘটি কি ঘড়ার গায়ে শাবল ঠেকিয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে কার ধন এখানে আসিল, তার পরিচয় আগে দিই।

বুড়ার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান। সে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত, কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়িয়া, রসকলি ও খঞ্জনিতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল। এখন শ্রীবৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী, সেখানকার বৈষ্ণবদিগের মধুর জয়দেব-গীতি, শ্রীমদ্ভাগবতে পাণ্ডিত্য, আর নধর গড়ন দেখিয়া, তৎপাদপদ্মনিকর সেবনপূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চয়ে মন দিল। দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন গরিব ; বিষয়কর্ম্মের অন্বেষণে মুর্শিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের চাকুরি যুটিল। কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবী যে বড় সুন্দরী, নবাবমহলে সে সংবাদ পৌঁছিল। এক জন হাব্‌সী খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী লোভে পড়িয়া রাজি হইল। আবার বেগোছ দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজী, বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কোথায় যান ? কৃষ্ণগোবিন্দ মনে করিলেন, এ অমূল্য ধন লইয়া লোকালয়ে বাস অনুচিত। কে কোন্ দিন কাড়িয়া লইবে। তখন বাবাজী বৈষ্ণবীকে পদ্মাপার লইয়া আসিয়া, একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পর্য্যটন করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, লোকের চক্ষু হইতে তাঁর অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে। এখানে যম ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহারা সেইখানে

রহিল। বাবাজী সপ্তাহে সপ্তাহে হাটে গিয়া বাজার করিয়া আনেন। বৈষ্ণবীকে কোথাও বাহির হইতে দেন না।

এক দিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নীচের ঘরে চুলা কাটিতেছিল,—মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা সেকেলে—তখনকার পক্ষেও সেকেলে মোহর পাওয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুঁড়িল। এক ভাঁড় টাকা পাইল।

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ণগোবিন্দের দিন চলা ভার হইত। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দের এক নূতন জ্বালা হইল। টাকা পাইয়া তাহার স্মরণ হইল যে, এই রকম পুরাতন বাড়ীতে অনেকে অনেক ধন মাটির ভিতর পাইয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে আরও টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ অনুদিন প্রোথিত ধনের সন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক সুরঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোর-কুঠরী বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছু পাইল না। এক বৎসর এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ কিছু শান্ত হইল। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে নীচের চোর-কুঠরীতে গিয়া সন্ধান করিত। এক দিন দেখিল, এক অন্ধকার ঘরে, এক কোণে একটা কি চক্‌চক্ করিতেছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহা তুলিল—দেখিল, মোহর! ইন্দুরে মাটি তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ তখন কিছু করিল না, হাটবারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবার হাটবারে বৈষ্ণবীকে বলিল, "আমার বড় অসুখ করিয়াছে, তুমি হাট করিতে যাও।" বৈষ্ণবী সকালে হাট করিতে গেল। বাবাজী বুঝিলেন, বৈষ্ণবী এক দিন ছুটি পাইয়াছে, শীঘ্র ফিরিবে না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই অবকাশে সেই কোণ খুঁড়িতে লাগিল। সেখানে কুড়ি ঘড়া ধন বাহির হইল।

পূর্ব্বকালে উত্তর-বাঙ্গালায়, নীলধ্বজবংশীয় প্রবলপরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন। সে বংশে শেষ রাজা নীলাম্বর দেব। নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল—অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল। এই একটি রাজভবন। এখানে বৎসরে দুই এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর-বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার

হইতে ধন সকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে, কোথায় ধন রহিল। যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইলেন। পাঠান-সেনাপতি তাঁহাকে গৌড়ে চালান করিল। তার পর আর তাঁহাকে মনুষ্য-লোকে কেহ দেখে নাই। তাঁহার শেষ কি হইল, কেহ জানে না। তিনি আর কখনও দেশে ফেরেন নাই। সেই অবধি তাঁহার ধনরাশি সেইখানে পোঁতা রহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্ণগোবিন্দ পাইল। সুবর্ণ, হীরক, মুক্তা, অন্য রত্ন অসংখ্য—অগণ্য, কেহ স্থির করিতে পারে না কত। কৃষ্ণগোবিন্দ কুড়ি ঘড়া এইরূপ ধন পাইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে এক দিনের তরেও এ ধনের কথা কিছুই জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মত বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল। সেই ধন এখন প্রফুল্ল পাইল। ঘড়াগুলি বেশ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, সেই বিচালির বিছানায় প্রফুল্ল শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

এখন একটু ফুলমণির কথা বলি। ফুলমণি নাপিতানী হরিণীর ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া দ্রুতপদ জীবে প্রাণ-সমর্পণ করিয়াছিল। ডাকাইতের ভয়ে দুর্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্লভের এমনই পলাইবার রোখ্ যে, তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িনীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন। ফুলমণি যত ডাকে, "ও গো দাঁড়াও গো! আমায় ফেলে যেও না গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবা গো! ঐ এলো গো!" কাঁটা-বনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, এক পায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটা-বনে বিঁধিয়া তাঁহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, "ও অধঃপেতে মিন্‌সে—ওরে মেয়েমানুষকে ভুলিয়ে এনে—এমনি ক'রে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয় রে মিন্‌সে?" শুনিয়া দুর্লভচন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে ডাকাইতে ধরিয়াছে। অতএব দুর্লভচন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরও বেগে ধাবমান হইলেন। ফুলমণি ডাকিল, "ও অধঃপেতে—ও পোড়ারমুখো—ও আঁটকুড়ির পুত—ও হাবাতে—ও

ড্যাক্‌রা—ও বিট্‌লে।” ততক্ষণ দুর্লভ অদৃশ্য হইল। কাজেই ফুলমণিও গলাবাজি ক্ষান্ত দিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রোদনকালে দুর্লভের মাতাপিতার প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিল।

এদিকে ফুলমণি দেখিল, কই—ডাকাইতেরা ত কেহ আসিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল—কান্না বন্ধ করিল। শেষ দেখিল, না ডাকাইত আসে—না দুর্লভচন্দ্র দেখা দেয়। তখন জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তাহার ন্যায় চতুরার পক্ষে পথ পাওয়া বড় কঠিন হইল না। সহজেই বাহির হইয়া সে রাজপথে উপস্থিত হইল। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া, সে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দুর্লভের উপর তখন বড় রাগ।

অনেক বেলা হইলে ফুলমণি ঘরে পৌঁছিল। দেখিল, তাহার ভগিনী অলকমণি ঘরে নাই, স্নানে গিয়াছে। ফুলমণি কাহাকে কিছু না বলিয়া কপাট ভেজাইয়া শয়ন করিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই—ফুলমণি শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার দিদি আসিয়া তাহাকে উঠাইল—জিজ্ঞাসা করিল, “কি লা, তুই এখন এলি ?”

ফুলমণি বলিল, “কেন, আমি কোথায় গিয়াছিলাম ?”

অলকমণি। কোথায় আর যাবি ? বামুনদের বাড়ী শুতে গিয়েছিলি, তা এত বেলা অবধি এলি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

ফুল। তুই চোখের মাথা খেয়েছিস্ তার কি হবে ? ভোরের বেলা তোর সমুখ দিয়ে এসে শুলেম—দেখিস্ নে ?

অলকমণি বলিল, “সে কি, বোন ? আমি তোর বেলা দেখে তিন বার বামুনদের বাড়ী গিয়ে তোকে খুঁজে এলাম। তা তোকেও দেখ্‌লাম না—কাকেও দেখ্‌লাম না। হ্যাঁ লা ! প্রফুল্ল আজ কোথা গেছে লা ?”

ফুল। (শিহরিয়া) চুপ্ কর ! দিদি চুপ্ ! ও কথা মুখে আনিস্ না।

অল। (সভয়ে) কেন, কি হয়েছে ?

ফুল। সে কথা বল্‌তে নেই।

অল। কেন লা ?

ফুল। আমরা ছোট লোক—আমাদের দেবতা বামুনের কথায় কাজ কি, বোন ?

অল। সে কি ? প্রফুল্ল কি করেছে ?

ফুল। প্রফুল্ল কি আর আছে ?

অল। (পুনশ্চ সভয়ে) সে কি? কি বলিস্?

ফুল। (অতি অস্ফুটস্বরে) কারও সাক্ষাতে বলিস্ নে—কাল তার মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।

ভগিনী। অ্যাঁ!

অলকমণির গা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। ক্ষণপরেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড় উঠিল—তার পর আর কেহ কোথাও নাই। ফুলমণি মূর্চ্ছিতা হইয়া, দাঁতকপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল। ইত্যাদি। ইত্যাদি। ফুলমণি উপন্যাসের উপসংহারকালে দিদিকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, "এ সকল কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ না—দেখিস্, আমার মাথা খাস্।"

দিদি বলিলেন, "না গো! এ কথা কি বলা যায়?" কিন্তু কথিতা দিদি মহাশয়া তখনই চাল ধুইবার ছলে ধুচুনি হাতে পল্লী-পরিভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ঘরে ঘরে উপন্যাসটি সালঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, দেখ, এ কথা প্রচার না হয়। কাজেই ইহা শীঘ্র প্রচারিত হইয়া রূপান্তরে প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী গেল। রূপান্তর কিরূপ? পরে বলিব।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল, "এখন কি করি? কোথায় যাই? এ নিবিড় জঙ্গল ত থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কি প্রকারে? যাই বা কোথায়? বাড়ী ফিরিয়া যাইব? আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাই কি প্রকারে? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে, জানাজানি হবে, চোর ডাকাইতে কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায়? যাহাকে পাইব, তাহাকেই বা বিশ্বাস কি? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ? এ ধনের রাশির লোভ কে সম্বরণ করিবে?

প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল। শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল, "অদৃষ্টে যাহাই হোক, দারিদ্র্য-দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না। এইখানেই থাকিব। আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর

এ জঙ্গলে তফাৎ কি? সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এখানেও না। হয় তাই করিবে।”

এইরূপ মনস্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘর দ্বার পরিষ্কার করিল। গোরুর সেবা করিল। শেষ, রন্ধনের উদ্যোগ। রাঁধিবে কি? হাঁড়ি, কাঠ, চাল, দাল, সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল। প্রফুল্লের যে সাহস অলৌকিক, তাহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইয়াছে।

এ জঙ্গলে হাট কোথায়? প্রফুল্ল ভাবিল, “সন্ধান করিয়া লইব।” জঙ্গলে পথের রেখা আছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, “কোথা যাইবে, মা?”

প্র। আমি হাটে যাইব।

ব্রাহ্মণ। এ দিকে হাটের পথ কোথা?

প্র। তবে কোন্ দিকে?

ব্রা। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

প্র। এই জঙ্গল হইতেই।

ব্রা। এই জঙ্গলে তোমার বাস?

প্র। হাঁ।

ব্রা। তবে তুমি হাটের পথ চেন না?

প্র। আমি নূতন আসিয়াছি।

ব্রা। এ বনে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক আসে না। তুমি কেন আসিলে?

প্র। আমাকে হাটের পথ বলিয়া দিন।

ব্রা। হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যাইতে পারিবে না। চোর ডাকাইতের বড় ভয়। তোমার আর কে আছে?

প্র। আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রফুল্লের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মনে মনে বলিল, “এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভাল, দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি?” প্রকাশ্যে বলিল, “তুমি

একা হাটে যাইও না। বিপদে পড়িবে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখান হইতে চাল দাল কিনিতে পার।"

প্রফুল্ল বলিল, "সেই হলে ভাল হয়। কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত দেখিতেছি।"

ব্রা। ব্রাহ্মণপণ্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা! তুমি আমার সঙ্গে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরও নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লের একটু একটু ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নাই? দেখিল, সেখানে একখানি কুটীর আছে—তালা চাবি বন্ধ, কেহ নাই। ব্রাহ্মণ তালা চাবি খুলিল। প্রফুল্ল দেখিল,—দোকান নয়, তবে হাঁড়ি, কলসী, চাল, দাল, নুন, তেল যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ বলিল, "তুমি যাহা একা বহিয়া লইয়া যাইতে পার, লইয়া যাও।"

প্রফুল্ল যাহা পারিল, তাহা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "দাম কত দিতে হইবে?"

ব্রা। এক আনা।

প্র। আমার নিকট পয়সা নাই।

ব্রা। টাকা আছে? দাও, ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।

প্র। আমার কাছে টাকাও নাই।

ব্রা। তবে কি নিয়া হাটে যাইতেছিলে?

প্র। একটি মোহর আছে।

ব্রা। দেখি।

প্রফুল্ল মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিল; বলিল, "মোহর ভাঙ্গাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চল, তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই, তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও।"

প্র। ঘরেও আমার পয়সা নাই।

ব্রা। সবই মোহর! তা হৌক, চল, তোমার ঘর চিনিয়া আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিও। আমি গিয়া নিয়া আসিব।

এখন "সবই মোহর" কথাটা প্রফুল্লের কানে ভাল লাগিল না। প্রফুল্ল বুঝিল যে, এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে, প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে। আর সেই লোভেই তাহার বাড়ী দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। প্রফুল্ল জিনিষপত্র যাহা লইয়াছিল, তাহা রাখিল। বলিল, "আমাকে হাটেই যাইতে হইবে। আমার কাপড়চোপড়ের বরাৎ আছে।"

ব্রাহ্মণ হাসিল। বলিল, "মা! মনে করিতেছ, আমি তোমার বাড়ী চিনিয়া আসিলে, তোমার মোহরগুলি চুরি করিয়া লইব? তা তুমি কি মনে করিয়াছ, হাটে গেলেই আমাকে এড়াইতে পারিবে? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কি প্রকারে?"

সর্ব্বনাশ! প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না।—আমাকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আমি ডাকাইতের সর্দ্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।"

প্রফুল্ল স্পন্দহীন। ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভবানী বলিল, "বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।"

এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা নাগরা বা দামামা বাহির করিয়া, তাহাতে গোটাকত ঘা দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক যমের মত জওয়ান লাঠি সড়কি লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আজ্ঞা হয়?"

ভবানী বলিল, "এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ। ইহাকে আমি মা বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং মার মত দেখিবে। তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না, আর কাহাকেও করিতে দিবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।" এই বলিবামাত্র সেই দস্যুদল মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল। প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি; একেবারেই বুঝিল যে, ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, "চলুন, আপনাকে আমার বাড়ী দেখাইতেছি।"

প্রফুল্ল দ্রব্য সামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল, তাহা আবার লইল। সে আগে চলিল, ভবানী পাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া, ভবানী ঠাকুরকে বসিতে, প্রফুল্ল একখানা ছেঁড়া কুশাসন দিল। বৈরাগীর একখানি ছেঁড়া কুশাসন ছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী পাঠক বলিল, "এই ভাঙ্গা বাড়ীতে তুমি মোহর পাইয়াছ?"

প্র। আজ্ঞা হাঁ।

ভ। কত?

প্র। অনেক।

ভ। ঠিক বল কত। ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ী খুঁড়িয়া দেখিবে।

প্র। কুড়ি ঘড়া।

ভ। এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?

প্র। দেশে লইয়া যাইব।

ভ। রাখিতে পারিবে?

প্র। আপনি সাহায্য করিলে পারি।

ভ। এই বনে আমার পূর্ণ অধিকার। এই বনের বাহিরে আমার তেমন ক্ষমতা নাই। এ বনের বাহিরে ধন লইয়া গেলে, আমি রাখিতে পারিব না।

প্র। তবে আমি এই বনেই এই ধন লইয়া থাকিব। আপনি রক্ষা করিবেন?

ভ। করিব। কিন্তু তুমি এত ধন লইয়া কি করিবে?

প্র। লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করে?

ভ। ভোগ করে।

প্র। আমিও ভোগ করিব।

ভবানী ঠাকুর "হোঃ হো!" করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রফুল্ল অপ্রতিভ হইল। দেখিয়া ভবানী বলিল, "মা! বোকা মেয়ের মত কথাটা বলিলে, তাই হাসিলাম। তোমার ত কেহই নাই বলিয়াছ, তুমি কাকে নিয়া এ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে? একা কি ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়?"

প্রফুল্ল অধোবদন হইল। ভবানী বলিতে লাগিল, "শোন। লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া, কেহ ভোগ করে, কেহ পুণ্যসঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে। তোমার ভোগ করিবার যো নাই। কেন না, তোমার কেহ নাই। তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিতে পার, না হয় নরকের পথ সাফ করিতে পার। কোন্‌টা করিবে?"

প্রফুল্ল বড় সাহসী। বলিল, "এ সকল কথা ত ডাকাইতের সর্দ্দারের মত নহে।"

ব্রা। না; আমি কেবল ডাকাইতের সর্দ্দার নহি। তোমার কাছে আর আমি ডাকাইতের সর্দ্দার নহি, তোমাকে আমি মা বলিয়াছি, সুতরাং আমি এক্ষণে তোমার পক্ষে

ভাল যা, তাই বলিব। ধনের ভোগ তোমার হইতে পারে না—কেন না, তোমার কেহ নাই। তবে এই ধনের দ্বারা, বিস্তর পাপ, অথবা বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় করিতে পার। কোন্ পথে যাইতে চাও?

প্র। যদি বলি, পাপই করিব?

ভ্রা। আমি তাহা হইলে, লোক দিয়া, তোমার ধন তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে এ বনের বাহির করিয়া দিব। এ বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে যে, তোমার এই ধনের লোভে, তোমার সঙ্গে পাপাচরণ করিতে সম্মত হইবে। অতএব তোমার সে মতি হইলে, আমি তোমাকে এই দণ্ডে এখান হইতে বিদায় করিতে বাধ্য। এ বন আমারই।

প্র। লোক দিয়া আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কি?

ভ। রাখিতে পারিবে কি? তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, যদিও ডাকাইতের হাতে উদ্ধার পাও—কিন্তু রূপ যৌবনের হাতে উদ্ধার পাইবে না। পাপের লালসা না ফুরাইতে ফুরাইতে ধন ফুরাইবে। যতই কেন ধন থাক্ না, শেষ করিলে শেষ হইতে বিস্তর দিন লাগে না। তার পর, মা?

প্র। তার পর কি?

ভ। নরকের পথ সাফ। লালসা আছে, কিন্তু লালসাপরিতৃপ্তির উপায় নাই—সেই নরকের পরিষ্কার পথ। পুণ্য সঞ্চয় করিবে?

প্র। বাবা! আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাইব? আমি বড় কাঙ্গাল—আমার অন্নবস্ত্র যুটিলেই ঢের, আমি ধন চাই না—দিনপাত হইলেই হইল। এ ধন তুমি সব নাও—আমি নিষ্পাপে যাতে এক মুটো অন্ন পাই, তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।

ভবানী মনে মনে প্রফুল্লকে ধন্যবাদ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, "ধন তোমার। আমি লইব না।"

প্রফুল্ল বিস্মিত হইল। মনের ভাব বুঝিয়া ভবানী বলিল, "তুমি ভাবিতেছ, ডাকাইতি করে, পরের ধন কাড়িয়া খায়, আবার এ রকম ভাণ করে কেন? সে কথা তোমায় এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে তুমি যদি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমার এ ধন লুঠ করিয়া লইলেও লইতে পারি। এখন এ ধন লইব না। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি —এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?"

প্র। আপনি দেখিতেছি জ্ঞানী, আপনি আমায় শিখাইয়া দিন, ধন লইয়া কি করিব।

ভ। শিখাইতে পাঁচ সাত বৎসর লাগিবে। যদি শেখ, আমি শিখাইতে পারি। এই পাঁচ সাত বৎসর তুমি ধন স্পর্শ করিবে না। তোমার ভরণপোষণের কোন কষ্ট হইবে না। তোমার খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে। কেমন, স্বীকৃত আছ?

প্র। বাস করিব কোথায়?

ভ। এইখানে। ভাঙ্গা চোরা একটু একটু মেরামত করিয়া দিব।

প্র। এইখানে একা বাস করিব?

ভ। না, আমি দুই জন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিব। তাহারা তোমার কাছে থাকিবে। কোন ভয় করিও না। এ বনে আমি কর্ত্তা। আমি থাকিতে তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

প্র। আপনি কিরূপে শিখাইবেন?

ভ। তুমি লিখিতে পড়িতে জান?

প্র। না।

ভ। তবে প্রথমে লেখা পড়া শিখাইব।

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। এ অরণ্যমধ্যে একজন সহায় পাইয়া সে আহ্লাদিত হইল।

ভবানী ঠাকুর বিদায় হইয়া সেই ভগ্ন অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে। ভবানী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঙ্গরাজ! এখানে কেন?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার সন্ধানে। আপনি এখানে কেন?"

ভ। যা এত দিন সন্ধান করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি।

রঙ্গ। রাজা?

ভ। রাণী।

রঙ্গ। রাজা রাণী আর খুঁজিতে হইবে না। ইংরেজ রাজা হইতেছে। কলিকাতায় না কি হষ্টিন* বলিয়া এক জন ইংরেজ ভাল রাজ্য ফাঁদিয়াছে।

ভ। আমি সে রকম রাজা খুঁজি না। আমি খুঁজি যা, তা ত তুমি জান।

---

* Warren Hastings.

রঙ্গ। এখন পাইয়াছেন কি ?

ভ। সে সামগ্রী পাইবার নয়, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভাল পাইয়াছি ; এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে। দেখিও, এই বাড়ীতে আমি ভিন্ন আর কোন পুরুষমানুষ না প্রবেশ করিতে পায়। মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী।

রঙ্গ। যে আজ্ঞা। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্জনপুর লুঠিয়াছে। তাই আপনাকে খুঁজিতেছি।

ভ। চল, তবে আমরা ইজারাদারের কাছারি লুঠিয়া, গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি। গ্রামের লোক আনুকূল্য করিবে ?

রঙ্গ। বোধ হয় করিতে পারে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী ঠাকুর অঙ্গীকার মত দুই জন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন। একজন হাটে ঘাটে যাইবে, আর একজন প্রফুল্লের কাছে অনুক্ষণ থাকিবে। দুই জন দুই রকমের। যে হাটে ঘাটে যাইবে, তাহার নাম গোব্‌রার মা, বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা। যদি একেবারে কানে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না, কোন মতে ইসারা ইঙ্গিতে চলিত ; কিন্তু এ তা নয়। কোন কোন কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন কথা শুনিতে পায় না। এ রকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাধে।

যে কাছে থাকিবার জন্য আসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। বয়সে প্রফুল্লের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড় হইবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—বর্ষাকালের কচি পাতার মত রঙ। রূপ উছলিয়া পড়িতেছে।

দুই জনে একত্র আসিল—যেন পূর্ণিমা অমাবস্যার হাত ধরিয়াছে। গোব্‌রার মা প্রফুল্লকে প্রণাম করিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি গা ?"

গোব্‌রার মা শুনিতে পাইল না ; অপরা বলিল, "ও একটু কালা—ওকে সবাই গোব্‌রার মা বলে।"

প্র। গোব্‌রার মা ! তোমার কয়টি ছেলে গা ?

গোব্‌রার মা। আমি ছিলেম আর কোথায় ? বাড়ীতে ছিলেম।

প্র। তুমি কি জেতের মেয়ে ?

গোবরার মা। যেতে আস্‌তে খুব পার্‌ব। যেখানে বলিবে, সেইখানেই যাব।

প্র। বলি, তুমি কি লোক ?

গোবরার মা। আর তোমার লোকে কাজ কি মা! আমি একাই তোমার সব কাজ ক'রে দেব। কেবল দুই একটা কাজ পার্‌ব না।

প্র। পার্‌বে না, কি ?

গোব্‌রার মার কান ফুটিল। বলিল, "পার্‌ব না, কি ? এই জল তুল্‌তে পার্‌ব না। আমার কাঁকালে জোর নাই। আর কাপড়চোপড় কাচা—তা না হয় মা, তুমিই ক'রো।"

প্র। আর সব পার্‌বে ত ?

গো-মা। বাসনটাসনগুলো মাজা—তাও না হয় তুমি আপনিই কর্‌লে।

প্র। তাও পার্‌বে না ; তবে পার্‌বে কি ?

গো-মা। আর এমন কিছু না—এই ঘর ঝেঁটোন, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারি নে।

প্র। পার্‌বে কি ?

গো-মা। আর যা বল। সল্‌তে পাকাব, জল গড়িয়ে দেব, আমার এঁটো পাতা ফেল্‌বো,—আর আসল কাজ যা যা, তা কর্‌ব—হাট কর্‌ব।

প্র। বেসাতির হিসাবটা দিতে পার্‌বে ?

গো-মা। তা মা, আমি বুড়ো মানুষ, হালা কালা, আমি কি অত পারি! তবে কড়িপাতি যা দেবে, তা সব খরচ করে আস্‌ব—তুমি বল্‌তে পাবে না যে, আমার এই খরচটা হলো না।

প্র। বাছা, তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।

গো-মা। তা মা, যা বল, তোমার আপনার গুণে বল।

প্রফুল্ল অপরাকে তখন বলিল, "তোমার নাম কি গা ?"

নবাগতা সুন্দরী বলিল, "তা ভাই, জানি না।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "সে কি ; বাপ মায় কি নাম রাখে নাই ?"

সুন্দরী বলিল, "রাখাই সম্ভব। কিন্তু আমি সবিশেষ অবগত নহি।"

প্র। সে কি গো ?

সুন্দরী। জ্ঞান হইবার আগে হইতে আমি বাপ মার কাছছাড়া। ছেলেবেলায় আমায় ছেলেধরায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্র। বটে। তা তারাও ত একটা নাম রেখেছিল?

সুন্দরী। নানা রকম।

প্র। কি কি?

সুন্দরী। পোড়ারমুখী, লক্ষ্মীছাড়ী, হতভাগী, চুলোমুখী।

এতক্ষণ গোব্‌রার মা আবার কান হারাইয়াছিল। এই কয়টা সদাশ্রুত গুণবাচক শব্দে শ্রুতি জাগরিত হইল। সে বলিল, "যে আমায় পোড়ারমুখী বলে, সেই পোড়ারমুখী, যে আমায় চুলোমুখী বলে, সেই চুলোমুখী, যে আমায় আঁটকুড়ী বলে, সেই আঁটকুড়ী"—

সুন্দরী। (হাসিয়া) আঁটকুড়ী বলি নাই, বাছা!

গো-মা। তুই আঁটকুড়ী বলিলেও বলেছিস্, না বলিলেও বলেছিস্—কেন বল্‌বি লা?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "তোমাকে বল্‌চে না গো—ও আমাকে বল্‌চে।"

তখন নিশ্বাস ফেলিয়া গোব্‌রার মা বলিল, "ও কপাল! আমাকে না? তা বলুক মা, বলুক, তুমি রাগ ক'রো না। ও বামনীর মুখটা বড় কদুর্য্যি। তা বাছা! রাগ কর্‌তে নেই।" গোব্‌রার মার মুখে এইরূপ আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা শুনিয়া যুবতীদ্বয় প্রীতা হইলেন। প্রফুল্ল অপরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামনী? তা আমাকে এতক্ষণ বল নাই? আমার প্রণাম করা হয় নাই।" প্রফুল্ল প্রণাম করিল।

বয়স্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "আমি বামনের মেয়ে বটে—এইরূপ শুনিয়াছি—কিন্তু বামনী নই।"

প্র। সে কি?

বয়স্যা। বামন যোটে নাই।

প্র। বিবাহ হয় নাই? সে কি?

বয়স্যা। ছেলেধরায় কি বিয়ে দেয়?

প্র। চিরকাল তুমি ছেলেধরার ঘরে?

বয়স্যা। না, ছেলেধরায় এক রাজার বাড়ী বেচে এয়েছিল।

প্র। রাজারা বিয়ে দিল না?

বয়স্যা। রাজপুত্র ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু বিবাহটা গান্ধর্ব্বমত।

প্র। নিজে পাত্র বুঝি?

বয়স্যা। তাও কয় দিনের জন্য বলিতে পারি না।

প্র। তার পর?

বয়স্যা। রকম দেখিয়া পলায়ন করিলাম।

প্র। তার পর?

বয়স্যা। রাজমহিষী কিছু গহনা দিয়াছিলেন, গহনা সমেত পলাইয়াছিলাম। সুতরাং ডাকাইতের হাতে পড়িলাম। সে ডাকাইতের দলপতি ভবানী ঠাকুর, তিনি আমার কাহিনী শুনিয়া আমার গহনা লইলেন না, বরং আরও কিছু দিলেন। আপনার গৃহে আমায় আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁহার কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্র। এক প্রকার কি?

বয়স্যা। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কি রকম?

বয়স্যা। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্র। তিনিই তোমার স্বামী?

বয়স্যা। হাঁ—কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

মূর্খ ব্রজেশ্বর এত জানিত না।

বয়স্যা বলিল, "শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।"

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্মপ্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ! স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দু-সমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, "আমি অত কথা ভাই, বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কি, এখনও ত বলিলে না?"

বয়স্যা বলিল, "ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি, আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে এক দিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, শোন। ঈশ্বরই

পরমস্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন, ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে?”

প্র। দূর্! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?

নিশি। মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।

প্র। আমি তা আজও জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।

প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিশি বলিল, “বুঝিয়াছি বোন্—তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।” তখন নিশি প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার চক্ষের জল মুছাইল। বলিল, “এত জানিতাম না।” নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতি-ভক্তি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে রাত্রে দুর্লভ চক্রবর্ত্তী প্রফুল্লকে তাহার মাতার বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া যায়, দৈবগতিকে ব্রজেশ্বর সেই রাত্রেই প্রফুল্লের বাসস্থানে দুর্গাপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রজেশ্বরের একটি ঘোড়া ছিল, ঘোড়ায় চড়িতে ব্রজেশ্বর খুব মজ্‌বুত। যখন বাড়ীর সকলে ঘুমাইল, ব্রজেশ্বর গোপনে সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অন্ধকারে দুর্গাপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন তিনি প্রফুল্লের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, তখন সে ভবন জনশূন্য, অন্ধকারময়। প্রফুল্লকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে। সেই রাত্রে ব্রজেশ্বর পাড়াপড়শী কাহাকেও পাইলেন না যে, জিজ্ঞাসা করেন।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে না দেখিতে পাইয়া মনে করিল যে, প্রফুল্ল একা থাকিতে না পারিয়া কোন কুটুম্ববাড়ী গিয়াছে। ব্রজেশ্বর অপেক্ষা করিতে পারিল না। বাপের ভয়, রাত্রিমধ্যেই ফিরিয়া আসিল। তার পর কিছু দিন গেল। হরবল্লভের সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। সকলে খায় দায় বেড়ায়—সংসারের কাজ করে। ব্রজেশ্বরের দিন কেবল ঠিক সে রকম যায় না। হঠাৎ কেহ কিছু বুঝিল না—জানিল না। প্রথমে মা জানিল। গৃহিণী দেখিল, ছেলের পাতে দুধের বাটিতে দুধ পড়িয়া থাকে, মাছের মুড়ার কেবল কণ্ঠার মাছটাই ভুক্ত হয়, “রান্না ভাল হয় নাই” বলিয়া, ব্রজ ব্যঞ্জন ঠেলিয়া রাখে। মা মনে করিলেন, “ছেলের মন্দাগ্নি হইয়াছে।” প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোট্‌কার ব্যবস্থা করিলেন, তার পর কবিরাজ ডাকিবার কথা হইল। ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। মাকে ব্রজ হাসিয়া

উড়াইয়া দিল, কিন্তু ব্রহ্মঠাকুরাণীকে পারিল না। বুড়ী ব্রজেশ্বরকে এক দিন একা পাইয়া চাপিয়া ধরিল।

"হ্যাঁ রে ব্রজ, তুই আর নয়ানবৌয়ের মুখ দেখিস্ না কেন?"

ব্রজ হাসিয়া বলিল, "মুখখানি একে অমাবস্যার রাত্রি, তাতে মেঘ ঝড় ছাড়া নেই—দেখিতে বড় সাধ নেই।"

ব্রহ্ম। তা মরুক্ গে, সে নয়ানবৌ বুঝ্বে—তুই খাস্ নে কেন?

ব্রজ। তুমি যে রাঁধ!

ব্রহ্ম। আমি ত চিরকালই এমনি রাঁধি।

ব্রজ। আজ কাল হাত পেকেছে।

ব্রহ্ম। দুধও বুঝি আমি রাঁধি? সেটাও কি রান্নার দোষ?

ব্রজ। গরুগুলোর দুধ বিগ্‌ড়ে গিয়াছে।

ব্রহ্ম। তুই হাঁ করে রাতদিন ভাবিস্ কি?

ব্রজ। কবে তোমায় গঙ্গায় নিয়ে যাব।

ব্রহ্ম। আর তোর বড়াইয়ে কাজ নাই! মুখে অমন অনেকে বলে! শেষে এই নিমগাছের তলায় আমায় গঙ্গায় দিবি—তুলসী গাছটাও দেখতে পাব না! তা তুই ভাব না যা হয়—কিন্তু তুই আমার গঙ্গা ভেবে ভেবে এত রোগা হ'য়ে গেলি কেন?

ব্রজ। ওটা কি কম ভাবনা?

ব্রহ্ম। কাল নাইতে গিয়ে রাণায় ব'সে কি, ভাই, ভাব্‌ছিলি? চোখ দিয়ে জল পড়ছিল কেন?

ব্রজ। ভাব্‌ছিলাম যে, স্নান করেই তোমার রান্না খেতে হবে। সেই দুঃখে চোখে জল এসেছিল।

ব্রহ্ম। সাগর এসে রেঁধে দিবে? তা হলে খেতে পার্‌বি ত?

ব্রজ। কেন, সাগর ত রোজ রাঁধিত? খেলা-ঘরে যাও নি কোনও দিন? ধুলা-চড়চড়ী, কাদার সুক্ত, ইটের ঘণ্ট—এক দিন আপনি খেয়ে দেখ না? তার পর আমায় খেতে ব'লো।

ব্রহ্ম। প্রফুল্ল এসে রেঁধে দিবে?

যেমন পথে কেহ প্রদীপ লইয়া যখন চলিয়া যায়, তখন পথিপার্শ্বস্থ অন্ধকার ঘরের উপর

সেই আলো পড়িলে, ঘর একবার হাসিয়া আবার তখনই আঁধার হয়, প্রফুল্লের নামে ব্রজেশ্বরের মুখ তেমনই হইল। ব্রজ উত্তর করিল, "বাগ্দী যে।"

ব্রহ্ম। বাগ্দী না। সবাই জানে, সে মিছে কথা। তোমার বাপের কেবল সমাজের ভয়। ছেলের চেয়ে কিছু সমাজ বড় নয়। কথাটা কি আবার পাড়্ব?

ব্রজ। না, আমার জন্য সমাজে আমার বাপের অপমান হবে—তাও কি হয়?

সে দিন আর বেশী কথা হইল না। ব্রহ্মঠাকুরাণীও সবটুকু বুঝিতে পারিলেন না। কথাটা বড় সোজা নয়। প্রফুল্লের রূপ অতুলনীয়,—একে ত রূপেই সে ব্রজেশ্বরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আবার সেই এক দিনেই ব্রজেশ্বর দেখিয়াছিলেন, প্রফুল্লের বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর। যদি প্রফুল্ল—বিবাহিতা স্ত্রী—স্বাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া নয়নতারার মত কাছে থাকিত, তবে এই উন্মাদকর মোহ সুস্নিগ্ধ স্নেহে পরিণত হইত। রূপের মোহ কাটিয়া যাইত, গুণের মোহ থাকিয়া যাইত। কিন্তু তা হইল না। প্রফুল্ল-বিদ্যুৎ একবার চমকাইয়া, চিরকালের জন্য অন্ধকারে মিশিল, সেই জন্য সেই মোহ সহস্র গুণে বল পাইল। কিন্তু এ ত গেল সোজা কথা। কঠিন এই যে, ইহার উপর দারুণ করুণা। সেই সোনার প্রতিমাকে তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়া, চিরকাল জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইয়াছে। সে এখন অন্নের কাঙ্গাল। বুঝি না খাইয়া মরিয়া যাইবে! যখন সেই প্রগাঢ় অনুরাগের উপর এই গভীর করুণা—তখন মাত্রা পূর্ণ। ব্রজেশ্বরের হৃদয় প্রফুল্লময়—আর কিছুরই স্থান নাই। বুড়ী এত কথাও বুঝিল না।

কিছু দিন পরে ফুলমণি নাপিতানীর প্রচারিত প্রফুল্লের তিরোধান-বৃত্তান্ত হরবল্লভের গৃহে পৌঁছিল। গল্প মুখে মুখে বদল হইতে হইতে চলে। সংবাদটা এখানে এইরূপ আকারে পৌঁছিল যে, প্রফুল্ল বাত-শ্লেষ্ম-বিকারে মরিয়াছে—মৃত্যুর পূর্ব্বে তার মরা মাকে দেখিতে পাইয়াছিল। ব্রজেশ্বরও শুনিল।

হরবল্লভ শৌচ স্নান করিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "বাগ্দীর শ্রাদ্ধ বামনে করিবে?" নয়নতারাও স্নান করিল—মাথা মুছিয়া বলিল, "একটা পাপ গেল—আর একটার জন্য নাওয়াটা নাইতে পার্লেই শরীর জুড়ায়।" কিছু দিন গেল। ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া শুকাইয়া, ব্রজেশ্বর বিছানা লইল। রোগ এমন কিছু নয়, একটু একটু জ্বর হয় মাত্র, কিন্তু ব্রজ নির্জ্জীব, শয্যাগত। বৈদ্য দেখিল। ঔষধপত্রে কিছু হইল না—রোগ বৃদ্ধি পাইল। শেষ ব্রজেশ্বর বাঁচে না বাঁচে।

আসল কথা আর বড় লুকান রহিল না। প্রথমে বুড়ী বুঝিয়াছিল, তার পর গিন্নী

বুঝিলেন। এ সকল কথা মেয়েরাই আগে বুঝে। গিন্নী বুঝিলেই, কাজেই কর্ত্তা বুঝিলেন। তখন হরবল্লভের বুকে শেল বিঁধিল। হরবল্লভ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ছি! ছি! কি করিয়াছি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছি!" গিন্নী প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ছেলে না বাঁচিলে আমি বিষ খাইব।" হরবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এবার দেবতা ব্রজেশ্বরকে বাঁচাইলে, আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোন কাজ করিব না।"

ব্রজেশ্বর বাঁচিল। ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল—ক্রমে শয্যা ত্যাগ করিল। এক দিন হরবল্লভের পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত। হরবল্লভ শ্রাদ্ধ করিতেছেন, ব্রজেশ্বর সেখানে কোন কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত আছেন। তিনি শুনিলেন, শ্রাদ্ধান্তে পুরোহিত মন্ত্র পড়াইলেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

কথাটি ব্রজেশ্বর কণ্ঠস্থ করিলেন। প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না আসিত, তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের পিতাই যে প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়িলেই ব্রজেশ্বর ভাবিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।"

প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচলা রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল। নিশি ঠাকুরাণী, রাজার ঘরে থাকিয়া, পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন—বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক প্রফুল্ল তাঁহার কাছে শিখিল। তার পর পাঠক ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করাইলেন। আরম্ভ করাইয়া দুই চারি দিন পড়াইয়া অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন। প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে নিশিও বিস্মিতা হইল। প্রফুল্লের

রন্ধন, ভোজন, শয়ন সব নামমাত্র, কেবল, "সু ঔ জস্, অম্ ঔ শস্" ইত্যাদিতে মন। নিশি বুঝিল যে, প্রফুল্ল সেই "দুই নূতন"কে ভুলিবার জন্য অনন্যচিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে। ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তার পর প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল। তখন আচার্য্য একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত এবং একটু ন্যায় শিখাইলেন। এ সকল অল্প অল্প মাত্র। এই সকল দর্শনে ভূমিকা করিয়া, প্রফুল্লকে সবিস্তার যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন; এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধীত করাইলেন। পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

এদিকে প্রফুল্লের ভিন্নপ্রকার শিক্ষাও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। গোব্‌রার মা কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে—সেটাও ভবানী ঠাকুরের ইঙ্গিতে। নিশিও বড় সাহায্য করে না, কাজেই প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়। তাহাতে প্রফুল্লের কষ্ট নাই—মাতার গৃহেও সকল কাজ নিজে করিতে হইত। প্রথম বৎসর তাহার আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা। আর কিছুই না। নিশির জন্য তাই। প্রফুল্লের তাহাতেও কোন কষ্ট হইল না। মার ঘরে সকল দিন এত যুটিত না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত—গোব্‌রার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খানা, ডোবা, বিল, খালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত; সুতরাং গোব্‌রার মা হাট হইতে একাদশীতে মাছ আনিতে আর আপত্তি করিত না।

দ্বিতীয় বৎসরে নিশির আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বমত রহিল। কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে কেবল নুন লঙ্কা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল, তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, ননী, ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, কিন্তু প্রফুল্লের নুন লঙ্কা ভাত। দুই জনে একত্র বসিয়া খাইবে। খাইবার সময়ে প্রফুল্ল ও নিশি দুই জনে বসিয়া হাসিত। নিশি ভাল সামগ্রী বড় খাইত না—গোব্‌রার মাকে দিত। এই পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল।

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল তাহা খাইল।

পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মত খাইল।

শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা সম্বন্ধে এতদনুরূপ অভ্যাসে ভবানী ঠাকুর শিষ্যাকে নিযুক্ত করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎসরে চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রীষ্মকালে একখানা মোটা গড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল, অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়। চতুর্থ বৎসরে পাট কাপড়, ঢাকাই কল্কাদার শান্তিপুরে। প্রফুল্ল সে সকল ছিঁড়িয়া খাটো করিয়া লইয়া পরিত। পঞ্চম বৎসরে বেশ ইচ্ছামত। প্রফুল্ল মোটা গড়াই বাহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত।

কেশবিন্যাস সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাঁধিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ। দিনরাত্র রুক্ষ চুলের রাশি আলুলায়িত থাকিত। তৃতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মুড়াইল। চতুর্থ বৎসরে নূতন চুল হইল; ভবানী ঠাকুর আদেশ করিলেন, "কেশ গন্ধ-তৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্ব্বদা রঞ্জিত করিবে।" পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন। প্রফুল্ল, পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিল না।

প্রথম বৎসরে তূলার তোষকে তূলার বালিশে প্রফুল্ল শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে বিচালীর বালিশ, বিচালীর বিছানা। তৃতীয় বৎসরে ভূমি-শয্যা। চতুর্থ বৎসরে কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। পঞ্চম বৎসরে প্রফুল্ল যেখানে পাইত, সেখানে শুইত।

প্রথম বৎসরে ত্রিযাম নিদ্রা। দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিযাম। তৃতীয় বৎসরে দুই দিন অন্তর রাত্রিজাগরণ। চতুর্থ বৎসরে তন্দ্রা আসিলেই নিদ্রা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। প্রফুল্ল রাত জাগিয়া পড়িত ও পুঁথি নকল করিত।

প্রফুল্ল জল, বাতাস, রৌদ্র, আগুন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের প্রতি আর একটি শিক্ষার আদেশ করিলেন, তাহা বলিতে লজ্জা করিতেছে; কিন্তু না বলিলেও কথা অসম্পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে।" প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল, শেষ বলিল, "ঠাকুর আর যা বলেন, তা শিখিব, এটি পারিব না।"

ভ। এটি নইলে নয়।

প্র। সে কি ঠাকুর! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে?

ভ। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য। দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।

প্র। কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে? পুরুষ মানুষের কাছে আমি মল্লযুদ্ধ শিখিতে পারিব না।

ভ। নিশি শিখাইবে। নিশি ছেলেধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ঠ বালক বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না।* তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল। আমি এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছি।

প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল।

প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকট যাইতেন—প্রফুল্ল নেড়া মাথায়, অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত। চতুর্থ বৎসরে ভবানী নিজ অনুচরদিগের মধ্যে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন; প্রফুল্লকে তাহাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বলিতেন। প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত। পঞ্চম বৎসরে কোন বিধি নিষেধ রহিল না। প্রয়োজনমত প্রফুল্ল পুরুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, নিষ্প্রয়োজনে করিত না। যখন প্রফুল্ল পুরুষ মানুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয়া কথা কহিত।

এই মত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানী ঠাকুর ঐশ্বর্য্যভোগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।

একাদশীর দিনে মাছ ছাড়া আর একটি বিষয়ে মাত্র প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। আপনার পরিচয় কিছু দিল না। ভবানী ঠাকুর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসরে অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া, ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে বলিলেন, "পাঁচ বৎসর হইল, তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ সমাপ্ত হইল। এখন তোমার হস্তগত ধন,

* এ কথা Warren Hastings নিজে লিখিয়াছেন।

তোমার ইচ্ছামত ব্যয় করিও—আমি নিষেধ করিব না। আমি পরামর্শ দিব,—ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিও। আহার আমি আর যোগাইব না,—তুমি আপনি আপনার দিনপাতের উপায় করিবে। কয়টি কথা বলিয়া দিই। কথাগুলি অনেক বার বলিয়াছি,—আর একবার বলি। এখন তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল, "কর্ম্ম করিব, জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্য নহে।"

ভবানী বলিল, "ভাল ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু কর্ম্ম, অসক্ত হইয়া করিতে হইবে। মনে আছে ত, ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥"

এখন অনাসক্তি কি? তাহা জান। ইহার প্রথম লক্ষণ, ইন্দ্রিয়-সংযম। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া তোমাকে তাহা শিখাইয়াছি, এখন আর বেশী বলিতে হইবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ, নিরহঙ্কার। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত, তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কাজই কর, তোমার গুণে তাহা হইল, কখনও তাহা মনে করিবে না। করিলে পুণ্য কর্ম্ম অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর তৃতীয় লক্ষণ এই যে, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

এখন বল দেখি মা, তোমার এই ধনরাশি লইয়া তুমি কি করিবে?"

প্র। যখন আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।

ভ। সব?

প্র। সব।

ভ। ঠিক তাহা হইলে কর্ম্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহ রক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষাতেও

আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহরক্ষা করিবে। আর সব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে এ ধন পৌঁছিবে কি প্রকারে?

প্র। শিখিয়াছি, তিনি সর্ব্বভূতস্থিত। অতএব সর্ব্বভূতে এ ধন বিতরণ করিব।

ভ। ভাল ভাল। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"*

কিন্তু এই সর্ব্বভূতসংক্রামক দানের জন্য অনেক কষ্ট, অনেক শ্রমের প্রয়োজন। তাহা তুমি পারিবে?

প্র। এত দিন কি শিখিলাম?

ভ। সে কষ্টের কথা বলিতেছি না। কখন কখন কিছু দোকানদারি চাই। কিছু বেশ-বিন্যাস, কিছু ভোগ-বিলাসের ঠাট প্রয়োজন হইবে। সে বড় কষ্ট। তাহা সহিতে পারিবে?

প্র। সে কি রকম?

ভ। শোন। আমি ত ডাকাইতি করি। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্র। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক্। এই ধন লইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হউন।

ভ। ধনে আমারও কোন প্রয়োজন নাই। ধনও আমার যথেষ্ট আছে। আমি ধনের জন্য ডাকাইতি করি না।

প্র। তবে কি?

ভ। আমি রাজত্ব করি।

প্র। ডাকাইতি কি রকম রাজত্ব?

ভ। যাহার হাতে রাজদণ্ড, সেই রাজা।

প্র। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ, ৩০-৩২।

ভ। এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইঙ্গরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্য শাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

প্র। ডাকাইতি করিয়া ?

ভ। শুন, বুঝাইয়া দিতেছি।

ভবানী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, প্রফুল্ল শুনিতে লাগিল।

ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্ব্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পূরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ্, সর্ব্বসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটাবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "এই দুরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি। কি প্রকারে করি, তাহা তুমি দুই দিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে ?"

প্রফুল্লের হৃদয় প্রজাবর্গের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া গলিয়া গিয়াছিল। সে ভবানী ঠাকুরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিল। বলিল, "আমি সঙ্গে যাইব। ধনব্যয়ে যদি আমার এখন অধিকার হইয়াছে, তবে আমি কিছু ধন সঙ্গে লইয়া যাইব। দুঃখীদিগকে দিয়া আসিব।"

ভ। এই কাজে দোকানদারি চাই, বলিতেছিলাম। যদি আমার সঙ্গে যাও, কিছু কিছু ঠাট সাজাইতে হইবে, সন্ন্যাসিনীবেশে এ কাজ সিদ্ধ হইবে না।

প্র। কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি। কর্ম্ম তাঁহার, আমার নহে। কর্ম্মোদ্ধারের জন্য যে সুখ দুঃখ, তাহা আমার নহে, তাঁরই। তাঁর কর্ম্মের জন্য যাহা করিতে হয়, করিব।

ভবানী ঠাকুরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি যখন ডাকাইতিতে সদলে বাহির হইলেন, প্রফুল্ল ধনের ঘড়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। নিশিও সঙ্গে গেল।

ভবানী ঠাকুরের অভিসন্ধি যাহাই হৌক, তাঁহার একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন

ছিল। তাই প্রফুল্লকে পাঁচ বৎসর ধরিয়া শাণ দিয়া, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু প্রফুল্লের মত নানাগুণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই—বিশেষ এত ধন কোন পুরুষের নাই। ধনের ধার বড় ধার। তবে ভবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল—প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত। যাহা হোক, এখন আমরা প্রফুল্লকে জীবনতরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়া আরও পাঁচ বৎসর ঘুমাই। প্রফুল্লের অন্য শিক্ষা হইয়াছে। কর্ম্মশিক্ষা হয় নাই। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া কর্ম্মশিক্ষা হোক।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঁচে পাঁচে দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। যেদিন প্রফুল্লকে বাগ্দীর মেয়ে বলিয়া হরবল্লভ তাড়াইয়া দিয়াছিল, সেদিন হইতে দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর হরবল্লভ রায়ের পক্ষে বড় ভাল গেল না। দেশের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার, তার উপরে ডাকাইতের অত্যাচার। একবার হরবল্লভের তালুক হইতে টাকা চালান আসিতেছিল, ডাকাইতে তাহা লুঠিয়া লইল। সে বার দেবী সিংহের খাজানা দেওয়া হইল না। দেবী সিংহ একখানা তালুক বেচিয়া লইল। দেবী সিংহের বেচিয়া লওয়ার প্রথা মন্দ ছিল না। হেষ্টিংস্ সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় সকল সরকারী কর্ম্মচারী দেবী সিংহের আজ্ঞাবহ ; বেচা কেনা সম্বন্ধে সে যাহা মনে করিত, তাহাই হইত। হরবল্লভের দশ হাজার টাকার মূল্যের তালুকখানা আড়াই শত টাকায় দেবী সিংহ নিজে কিনিয়া লইলেন। তাহাতে বাকি খাজানা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। দেবী সিংহের পীড়াপীড়িতে, কয়েদের আশঙ্কায়, হরবল্লভ আর একটা সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এই সকল কারণে আয় বড় কমিয়া আসিল। কিন্তু ব্যয় কিছুই কমিল না—বুনিয়াদি চাল খাটো করা যায় না। সকল লোকেরই প্রায় এমন না এমন এক দিন উপস্থিত হয়, যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন, "হয় সাবেক চাল ছাড়, নয় আমায় ছাড়।" অনেকেই উত্তর দেন, "মা ! তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না।" হরবল্লভ তাহারই একজন। দোল দুর্গোৎসব, ক্রিয়া কর্ম্ম, দান ধ্যান, লাঠালাঠি পূর্ব্বমতই হইতে লাগিল—বরং ডাকাইতে চালান লুঠিয়া লওয়া অবধি লাঠিয়ালের খরচটা কিছু বাড়িয়াছিল। খরচ আর কুলায় না। কিস্তি কিস্তি সরকারী খাজানা বাকি পড়িতে লাগিল। বিষয় আশয় যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বিক্রয় হইয়া যায়, আর থাকে না। দেনার উপর দেনা হইল, সুদে আসল ছাপাইয়া উঠিল—টাকা আর ধার পাওয়া যায় না।

এদিকে দেবী সিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ কিছুতেই টাকা দিতে পারেন না—শেষ হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইন কানুন খুঁজিতে হইত না, তখন ইংরেজের আইন হয় নাই। সব তখন বে-আইন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় ধুম পড়িয়াছে। ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন। কোন্ শ্বশুরবাড়ী, তাহা বলা বাহুল্য। সাগরের বাপের বাড়ী। তখনকার দিনে একটা জামাই আসা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তাতে আবার ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী সচরাচর আসে না। পুকুরে পুকুরে, মাছমহলে ভারি হুটাহুটি, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। জেলের দৌরাত্ম্যে প্রাণ আর রক্ষা হয় না। জেলে-মাগীদের হাঁটাহাঁটিতে পুকুরের জল কালী হইয়া যাইতে লাগিল। মাছ চুরির আশায় ছেলেরা পাঠশালা ছাড়িয়া দিল। দই, দুধ, ননী, ছানা, সর, মাখনের ফরমাইসের জ্বালায় গোয়ালার মাথা বেঠিক্ হইয়া উঠিল ; সে কখনও এক সের জল মিশাইতে তিন সের মিশাইয়া ফেলে, তিন সের মিশাইতে এক সের মিশাইয়া বসে। কাপড়ের ব্যাপারীর কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে করিতে পায় ব্যথা হইয়া গেল ; কাহারও পছন্দ হয় না, কোন্ ধুতি চাদর কে জামাইকে দিবে। পাড়ার মেয়ে মহলে বড় হাঙ্গামা পড়িল। যাহার যাহার গহনা আছে, তারা সে সকল সারাইতে, মাজিতে, ঘষিতে, নূতন করিয়া গাঁথাইতে লাগিল। যাহাদের গহনা নাই, তাহারা চুড়ি কিনিয়া, শাঁখা কিনিয়া, সোনা রূপা চাহিয়া চিন্তিয়া এক রকম বেশ-ভূষার যোগাড় করিয়া রাখিল—নহিলে জামাই দেখিতে যাওয়া হয় না। যাঁহাদের রসিকতার জন্য পশার আছে—তাঁহারা দুই চারিটা প্রাচীন তামাশা মনে মনে ঝালাইয়া রাখিলেন ; যাহাদের পশার নাই, তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল। কথার তামাশা পরে হবে—খাবার তামাশা আগে। তাহার জন্য ঘরে ঘরে কমিটি বসিয়া গেল। বহুতর কৃত্রিম আহার্য্য, পানীয়, ফল-মূল প্রস্তুত হইতে লাগিল। মধুর অধরগুলি মধুর হাসিতে ও সাধের মিশিতে ভরিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু যার জন্য এত উদ্যোগ, তার মনে সুখ নাই। ব্রজেশ্বর আমোদ আহ্লাদের জন্য শ্বশুরালয়ে আসেন নাই। বাপের গ্রেপ্তারির জন্য পরওয়ানা বাহির হইয়াছে—রক্ষার উপায় নাই। কেহ টাকা ধার দেয় না। শ্বশুরের টাকা আছে—শ্বশুর ধার দিলে দিতে পারে, তাই ব্রজেশ্বর শ্বশুরের কাছে আসিয়াছেন।

শ্বশুর বলিলেন, "বাপু হে, আমার যে টাকা, সে তোমারই জন্য আছে—আমার আর কে আছে, বল? কিন্তু টাকাগুলি যত দিন আমার হাতে আছে, তত দিন আছে,—তোমার বাপকে দিলে কি আর থাকবে? মহাজনে খাইবে। অতএব কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট করিতে চাও?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "হৌক—আমি ধনের প্রত্যাশী নই—আমার বাপকে বাঁচান আমার প্রথম কাজ।"

শ্বশুর রুক্ষভাবে বলিলেন, "তোমার বাপ বাঁচিলে আমার মেয়ের কি? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে—শ্বশুর বাঁচিলে দুঃখ ঘুচিবে না।"

কড়া কথায় ব্রজেশ্বরের বড় রাগ হইল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "তবে আপনার মেয়ে টাকা লইয়া থাকুক। বুঝিয়াছি, জামাইয়ে আপনার কোন প্রয়োজন নাই। আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম।"

তখন সাগরের পিতা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ব্রজেশ্বরকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। ব্রজেশ্বর কড়া কড়া উত্তর দিল। কাজেই ব্রজেশ্বর তল্পিতল্পা বাঁধিতে লাগিল। শুনিয়া, সাগরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

সাগরের মা জামাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাইকে অনেক বুঝাইলেন। জামাইয়ের রাগ পড়িল না। তার পর সাগরের পালা।

বধূ শ্বশুরবাড়ী আসিলে দিবসে স্বামীর সাক্ষাৎ পাওয়া সেকালে যতটা দুরূহ ছিল, পিত্রালয়ে ততটা নয়। সাগরের সঙ্গে নিভৃতে ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ হইল। সাগর ব্রজেশ্বরের পায় পড়িল, বলিল, "আর এক দিন থাক—আমি ত কোন অপরাধ করি নাই?"

ব্রজেশ্বরের তখন বড় রাগ ছিল—রাগে পা টানিয়া লইলেন। রাগের সময় শারীরিক ক্রিয়া সকল বড় জোরে জোরে হয়, আর হাতপায়ের গতিও ঠিক অভিমতরূপ হয় না। একটা করিতে বিকৃতি জন্য আর একটা হইয়া পড়ে। সেই কারণে, আর কতকটা সাগরের ব্যস্ততার কারণ, পা সরাইয়া লইতে প্রমাদ ঘটিল। পা একটু জোরে সাগরের গায়ে লাগিল। সাগর মনে করিল, স্বামী রাগ করিয়া আমাকে লাথি মারিলেন। সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিত ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "কি? আমায় লাথি মারিলে?"

বাস্তবিক ব্রজেশ্বরের লাথি মারিবার ইচ্ছা ছিল না,—তাই বলিলেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু একে রাগের সময়, আবার সাগর চোখ মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল,—ব্রজেশ্বরের রাগ বাড়িয়া গেল। বলিলেন, "যদি মারিয়াই থাকি? তুমি না হয় বড়মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার—তোমার বড়মানুষ বাপও এ পা এক দিন পূজা করিয়াছিলেন।"

সাগর রাগে জ্ঞান হারাইল। বলিল, "ঝক্‌মারি করিয়াছিলেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

ব্র। পাল্‌টে লাথি মারবে না কি?

সা। আমি তত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—

সাগরের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পিছনের জানালা হইতে কে বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া, চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

সাগরের মুখে সেই রকম কি কথা আসিতেছিল। সাগর না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পিছন ফিরিয়া না দেখিয়া, রাগের মাথায় সেই কথাই বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

ব্রজেশ্বরও রাগে সপ্তমে চড়িয়া কোন দিকে না চাহিয়া বলিল, "আমারও সেই কথা। যত দিন আমি তোমার পা টিপিয়া না দিই, তত দিন আমিও তোমার মুখ দেখিব না। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে আমি অব্রাহ্মণ।"

তখন রাগে রাগে তিনটা হইয়া ফুলিয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেল। সাগর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। এমন সময়ে সাগর যে ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিল, সেই ঘরে এক জন পরিচারিকা, ব্রজেশ্বর গেলে পর সাগরের কি অবস্থা হইয়াছে, ইহা দেখিবার অভিপ্রায়ে ভিতরে প্রবেশ করিল, ছুতানতা করিয়া দুই একটা কাজ করিতে লাগিল। তখন সাগরের মনে পড়িল যে, জানালা হইতে কে কথা কহিয়াছিল। সাগর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই জানেলা হইতে কথা কহিয়াছিলি?"

সে বলিল, "কই না?"

সাগর বলিল, "তবে কে জানেলায় দেখ্ ত।"

তখন সাক্ষাৎ ভগবতীর মত রূপবতী ও তেজস্বিনী এক জন স্ত্রীলোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে বলিল, "জানালায় আমি ছিলাম।"

সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?"

তখন সে স্ত্রীলোক বলিল, "তোমরা কি কেউ আমায় চেন না?"

সাগর বলিল, "না—কে তুমি?" তখন সেই স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "আমি দেবী চৌধুরাণী।"

পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল, ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। সেও কাঁপিতে কাঁপিতে আঁ—আঁ—আঁ—আঁ শব্দ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল। কাঁকালের কাপড় খসিয়া পড়িল।

দেবী চৌধুরাণী তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "চুপ রহো, হারামজাদি! খাড়া রহো।"

পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সাগরেরও গায়ে ঘাম দিতেছিল। সাগরের মুখেও কথা ফুটিল না। যে নাম তাহাদের কানে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ছেলে বুড়ো কে না শুনিয়াছিল? সে নাম অতি ভয়ানক।

কিন্তু সাগর আবার ক্ষণেক পরে হাসিয়া উঠিল। তখন দেবী চৌধুরাণীও হাসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে, জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে, আঁধারে, সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

সেই ত্রিস্রোতার উপরে, কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে, একটা বড় তেঁতুলগাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে—তাহার কথা পরে বলিব, আগে বজরার কথা বলি। বজরাখানি নানা বর্ণে চিত্রিত; তাহাতে কত রকম মূরদ আঁকা আছে। তাহার পিতলের হাতল ডাণ্ডা প্রভৃতিতে রূপার গিলটি। গলুইয়ে একটা হাঙ্গরের মুখ—সেটাও গিল্‌টি করা। সর্ব্বত্র পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, আবার নিস্তব্ধ। নাবিকেরা এক পাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে; কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর—এক জন মানুষ। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের

উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোল কলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পূরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পূরিয়া টল টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে ; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী ; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্য্যাদা নাই—কিন্তু এক শত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা-মুক্তা-খচিত কাঁচলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোনায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত ; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলের মত—সেই শুভ্র বসন ; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে ; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে ; তাহার সুগন্ধি-চূর্ণ-গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। এক ছড়া যূঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।

ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণা-বাদনে নিযুক্তা। চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে ; তাহার সঙ্গে সেই মৃদুমধুর বীণার ধ্বনিও মিশিতেছে—যেমন জলে জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে, এ বন্যকুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তরসকলে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতেছিল। ঝম্ ঝম্ ছন্ ছন্ ঝনন্ ঝনন্ ছনন্ ছনন্ দম্ দম্ দ্রিম্ দ্রিম্ বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জ্জিয়া উঠে,—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু—কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল

—কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল—নাদ, কুসুমের মালার মত নদী-কল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল। তার পর দুই একটা পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া সে বিদ্যাবতী ঝন্ ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কানের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল—মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল। তখন যাহারা পাল মুড়ি দিয়া এক প্রান্তে নিঃশব্দে নিদ্রিতবৎ শুইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক জন উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর নিকট দাঁড়াইল।

এ ব্যক্তি পুরুষ। সে দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠগঠন; ভারি রকমের এক যোড়া চৌগোঁপ্পা আছে। গলায় যজ্ঞোপবীত। সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

সেই স্ত্রীলোক বলিল, "দেখিতে পাইতেছ না?"

পুরুষ বলিল, "কিছু না। আসিতেছে কি?"

গালিচার উপর একটা ছোট দূরবীণ পড়িয়াছিল। দূরবীণ তখন ভারতবর্ষে নূতন আমদানী হইতেছিল। দূরবীণ লইয়া সুন্দরী ঐ ব্যক্তির হাতে দিল—কিছু বলিল না। সে দূরবীণ চক্ষে দিয়া নদীর সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিল। শেষ এক স্থানে আর একখানি বজরা দেখিতে পাইয়া বলিল, "দেখিয়াছি—টেঁকের মাথায়—ঐ কি?"

উ। এ নদীতে আজকাল আর কোন বজরা আসিবার কথা নাই।

পুরুষ পুনর্ব্বার দূরবীণ দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

যুবতী বীণা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, "রঙ্গরাজ!"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "আজ্ঞা?"

"দেখ কি?"

"কয় জন লোক আছে, তাই দেখি।"

"কয় জন?"

"ঠিক ঠাওর পাই না। বেশী নয়। খুলিব?"

"খোল—ছিপ। আঁধারে আঁধারে নিঃশব্দে উজাইয়া যাও।" তখন রঙ্গরাজ ডাকিয়া বলিল, "ছিপ খোল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বজরার কাছে তেঁতুলগাছের ছায়ায় আর একখানি নৌকা অন্ধকারে লুকাইয়াছিল। সেখানি ছিপ—ষাট হাত লম্বা, তিন হাতের বেশী চৌড়া নয়। তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ গাদাগাদি হইয়া শুইয়াছিল। রঙ্গরাজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সেই পঞ্চাশ জন একেবারে উঠিয়া বসিল। বাঁশের চেলা তুলিয়া সকলেই এক এক গাছা সড়্কি ও এক এক খানা ছোট ঢাল বাহির করিল। হাতিয়ার কেহ হাতে রাখিল না—সবাই আপনার নিকট চেলার উপরে সাজাইয়া রাখিল। রাখিয়া সকলেই এক এক খানা "বোটে" হাতে করিয়া বসিল।

নিঃশব্দে ছিপ খুলিয়া, তাহারা বজরায় আসিয়া লাগাইল। রঙ্গরাজ তখন নিজে পঞ্চ হাতিয়ার বাঁধিয়া উহার উপর উঠিল। সেই সময়ে যুবতী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "রঙ্গরাজ, আগে যাহা বলিয়া দিয়াছি, মনে থাকে যেন।"

"মনে আছে" বলিয়া রঙ্গরাজ ছিপে উঠিল। ছিপ নিঃশব্দে তীরে তীরে উজাইয়া চলিল। এদিকে যে বজরা রঙ্গরাজ দূরবীণে দেখিয়াছিল, তাহা নদী বাহিয়া খরস্রোতে তীব্রবেগে আসিতেছিল। ছিপকে বড় বেশী উজাইতে হইল না। বজরা নিকট হইলে, ছিপ তীর ছাড়িয়া বজরার দিকে ধাবমান হইল। পঞ্চাশখানা বোটে, কিন্তু শব্দ নাই।

এখন, সেই বজরার ছাদের উপরে আট জন হিন্দুস্থানী রক্ষক ছিল। এত লোক সঙ্গে না করিয়া তখনকার দিনে কেহ রাত্রিকালে নৌকা খুলিতে সাহস করিত না। আট জনের মধ্যে, দুই জন হাতিয়ারবন্ধ হইয়া, মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধিয়া ছাদের উপর বসিয়াছিল—আর ছয় জন মধুর দক্ষিণ বাতাসে চাঁদের আলোতে কাল দাড়ি ছড়াইয়া, সুনিদ্রা অভিভূত ছিল। যাহারা পাহারায় ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন দেখিল—ছিপ বজরার দিকে আসিতেছে। সে দস্তুরমত হাঁকিল, "ছিপ তফাৎ!"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "তোর দরকার হয়, তুই তফাৎ যা।"

প্রহরী দেখিল, বেগোছ। ভয় দেখাইবার জন্য বন্দুকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। রঙ্গরাজ বুঝিল, ফাঁকা আওয়াজ। হাসিয়া বলিল, "কি পাঁড়ে ঠাকুর! একটা ছর্‌রাও নাই? ধার দিব?"

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সেই প্রহরীর মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তার পর বন্দুক নামাইয়া বলিল, "তোমায় এবার মারিব না। এবার তোমার লাল পাগড়ি উড়াইব।" এই

কথা বলিতে বলিতে রঙ্গরাজ বন্দুক রাখিয়া, তীর ধনু লইয়া সজোরে তীর ত্যাগ করিল। প্রহরীর মাথার লাল পাগড়ি উড়িয়া গেল। প্রহরী "রাম রাম!" শব্দ করিতে লাগিল।

বলিতে বলিতে ছিপ আসিয়া বজরার পিছনে লাগিল। অমনি দশ বার জন লোক ছিপ হইতে হাতিয়ার সমেত বজরার উপর উঠিয়া পড়িল। যে ছয় জন হিন্দুস্থানী নিদ্রিত ছিল, তাহারা বন্দুকের আওয়াজে জাগরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোরে হাতিয়ার হাতড়াইতে তাহাদের দিন গেল। ক্ষিপ্রহস্তে আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে নিমেষমধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। যে দুই জন আগে হইতে জাগ্রত ছিল, তাহারা লড়াই করিল, কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অধিক, শীঘ্র তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন ছিপের লোক বজরার ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। বজরার দ্বার বন্ধ।

ভিতরে ব্রজেশ্বর। তিনি শ্বশুরবাড়ী হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। পথে এই বিপদ্। এ কেবল তাঁহার সাহসের ফল। অন্য কেহ সাহস করিয়া রাত্রে বজরা খুলিত না।

রঙ্গরাজ কপাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "মহাশয়! দ্বার খুলুন।"

ভিতর হইতে সদ্যোনিদ্রোত্থিত ব্রজেশ্বর উত্তর করিল, "কে? এত গোল কিসের?"

রঙ্গরাজ বলিল, "গোল কিছুই না—বজরায় ডাকাইত পড়িয়াছে।"

ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া, পরে ডাকিতে লাগিল, "পাঁড়ে! তেওয়ারি! রামসিং!"

রামসিং ছাদের উপর হইতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! শালা লোক্ সব্ কোইকো বাঁধ্‌কে রাক্‌খা।"

ব্রজেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। তোমাদের মত বীরপুরুষদের ডালরুটি খাইতে না দিয়া, বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! ডাকাইতের এ বড় ভ্রম। ভাবনা করিও না—কাল ডালরুটির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিব।"

শুনিয়া রঙ্গরাজও ঈষৎ হাসিল। বলিল, "আমারও সেই মত; এখন দ্বার খুলিবেন বোধ হয়।"

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

রঙ্গরাজ। আমি একজন ডাকাইত মাত্র। দ্বার খোলেন এই ভিক্ষা।

"কেন দ্বার খুলিব?"

রঙ্গরাজ। আপনার সর্ব্বস্ব লুটপাট করিব।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কেন? আমাকে কি হিন্দুস্থানী ভেড়ীওয়ালা পাইলে? আমার

হাতে দোনলা বন্দুক আছে—তৈয়ার, যে প্রথম কামরায় প্রবেশ করিবে, নিশ্চয় তাহার প্রাণ লইব।"

রঙ্গরাজ। এক জন প্রবেশ করিব না—কয় জনকে মারিবেন? আপনিও ব্রাহ্মণ—আমিও ব্রাহ্মণ। এক তরফ ব্রহ্মহত্যা হইবে। মিছামিছি ব্রহ্মহত্যায় কাজ কি?

ব্রজেশ্বর বলিল, "সে পাপটা না হয় আমিই স্বীকার করিব।"

এই কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মড়্ মড়্ শব্দ হইল। বজরার পাশের দিকের একখানা কপাট ভাঙ্গিয়া, একজন ডাকাইত কামরার ভিতর প্রবেশ করিল দেখিয়া, ব্রজেশ্বর হাতের বন্দুক ফিরাইয়া তাহার মাথায় মারিল। দস্যু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে রঙ্গরাজ বাহিরের কপাটে জোরে দুই বার পদাঘাত করিল। কবাট ভাঙ্গিয়া গেল। রঙ্গরাজ কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। ব্রজেশ্বর আবার বন্দুক ফিরাইয়া ধরিয়া, রঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে রঙ্গরাজ তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। দুই জনেই তুল্য বলশালী, তবে রঙ্গরাজ অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত। ব্রজেশ্বর ভাল করিয়া ধরিতে না ধরিতে, রঙ্গরাজ বন্দুক কাড়িয়া লইল। ব্রজেশ্বর তখন দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সমুদায় বলের সহিত রঙ্গরাজের মাথায় এক ঘুষি তুলিল। রঙ্গরাজ ঘুষিটা হাতে ধরিয়া ফেলিল। বজরার এক দিকে অনেক অস্ত্র ঝুলান ছিল। এই সময়ে ব্রজেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মধ্য হইতে একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া, হাসিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুর, ব্রহ্মহত্যায় আমার ভয় নাই।" এই বলিয়া রঙ্গরাজকে কাটিতে ব্রজেশ্বর তরবারি উঠাইল। সেই সময়ে আর চারি পাঁচ জন দস্যু মুক্তদ্বারে কামরার ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাঁহার উপর পড়িল। উত্থিত তরবারি হাত হইতে কাড়িয়া লইল। দুই জনে দুই হাত চাপিয়া ধরিল—একজন দড়ি লইয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "বাঁধিতে হইবে কি?" তখন ব্রজেশ্বর বলিল, "বাঁধিও না। আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। কি চাও বল—আমি দিতেছি।"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার যাহা কিছু আছে, সব লইয়া যাইব। কিছু ছাড়িয়া দিতে পারিতাম—কিন্তু যে কিল তুলিয়াছিলেন—আমার মাথায় লাগিলে মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত—এক পয়সাও ছাড়িব না।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "যাহা বজরায় আছে—সব লইয়া যাও, এখন আর আপত্তি করিব না।"

ব্রজেশ্বর এ কথা বলিবার পূর্ব্বেই দস্যুরা জিনিষপত্র বজরা হইতে ছিপে তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখন প্রায় পঁচিশ জন লোক বজরায় উঠিয়াছিল। জিনিষপত্র বজরায় বিশেষ কিছু ছিল না, কেবল পরিধেয় বস্ত্রাদি, পূজার সামগ্রী, এইরূপ মাত্র। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা সেই

সকল দ্রব্য ছিপে তুলিয়া ফেলিল। তখন আরোহী রঙ্গরাজকে বলিল, "সব জিনিষ লইয়াছ—আর কেন দিক্ কর, এখন স্বস্থানে যাও।"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "যাইতেছি। কিন্তু আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ব্র। সে কি? আমি কোথায় যাইব?

রঙ্গ। আমাদের রাণীর কাছে।

ব্র। তোমাদের আবার রাণী কে?

রঙ্গ। আমাদের রাজরাণী।

ব্র। তিনি আবার কে? ডাকাইতের রাজরাণী ত কখন শুনি নাই।

রঙ্গ। দেবী রাণীর নাম কখনও শুনেন নাই?

ব্র। ও হো! তোমরা দেবী চৌধুরাণীর দল?

রঙ্গ। দলাদলি আবার কি? আমরা রাণীজির কার্‌পর্‌দাজ।

ব্র। যেমন রাণী, তেমন কার্‌পর্‌দাজ! তা, আমাকে রাণী দর্শনে যাইতে হইবে কেন? আমাকে কয়েদ রাখিয়া কিছু আদায় করিবে, এই অভিপ্রায়?

রঙ্গ। কাজেই। বজরায় ত কিছু পাইলাম না। আপনাকে আটক করিলে যদি কিছু পাওয়া যায়।

ব্র। আমারও যাইবার ইচ্ছা হইতেছে—তোমাদের রাজরাণী একটা দেখবার জিনিষ শুনিয়াছি। তিনি না কি যুবতী?

রঙ্গ। তিনি আমাদের মা—সন্তানে মার বয়সের হিসাব রাখে না।

ব্র। শুনিয়াছি বড় রূপবতী।

রঙ্গ। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।

ব্র। চল, তবে ভগবতী-দর্শনে যাই।

এই বলিয়া, ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন যে, বজরার মাঝিমাল্লা সকলে ভয়ে জলে পড়িয়া কাছি ধরিয়া ভাসিয়া আছে। ব্রজেশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন তোমরা বজরায় উঠিতে পার—ভয় নাই। উঠিয়া আল্লার নাম নাও। তোমাদের জান ও মান ও দৌলৎ ও ইজ্জৎ সব বজায় আছে! তোমরা বড় হুঁসিয়ার!"

মাঝিরা তখন একে একে বজরায় উঠিতে লাগিল। ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার দ্বারবান্‌দের বাঁধন খুলিয়া দিতে পারি কি?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপত্তি নাই। উহারা যদি হাত খোলা পাইয়া, আমাদের উপর আক্রমণ করে, তখনই আমরা আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব। ইহা উহাদের বুঝাইয়া দিন।"

ব্রজেশ্বর দ্বারবান্‌দিগকে সেইরূপ বুঝাইয়া দিলেন। আর ভরসা দিলেন যে, তাহারা যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই তাহাদের ডালরুটির বরাদ্দ বাড়িবে। তখন ব্রজেশ্বর ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন যে, "তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এইখানে বজরা লইয়া থাক। কোথাও যাইও না বা কিছু করিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রঙ্গরাজের সঙ্গে ছিপে উঠিলেন। ছিপের নাবিকেরা "দেবী রাণী-কি জয়" হাঁকিল—ছিপ বাহিয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর যাইতে যাইতে রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কত দূর লইয়া যাইবে—তোমার রাণীজি কোথায় থাকেন?"

রঙ্গ। ঐ বজরা দেখিতেছ না? ঐ বজরা তাঁর।

ব্রজ। ও বজরা? আমি মনে করিয়াছিলাম, ওখানা ইঙ্গরেজের জাহাজ—রঙ্গপুর লুটিতে আসিয়াছে। তা অত বড় বজরা কেন?

রঙ্গ। রাণীকে রাণীর মত থাকিতে হয়। উহাতে সাতটা কামরা আছে।

ব্র। এত কামরায় কে থাকে?

রঙ্গ। একটায় দরবার। একটায় রাণীর শয়নঘর। একটায় চাক্‌রাণীরা থাকে। একটায় স্নান হয়। একটায় পাক হয়। একটা ফাটক। বোধ হয়, আপনাকে আজ সেই কামরায় থাকিতে হইবে।

এই কথোপকথন হইতে হইতে ছিপ আসিয়া বজরার পাশে ভিড়িল। দেবী রাণী ওরফে দেবী চৌধুরাণী তখন আর ছাদের উপর নাই। যতক্ষণ তাহার লোকে ডাকাইতি করিতেছিল, দেবী ততক্ষণ ছাদের উপর বসিয়া, জ্যোৎস্নালোকে বীণা বাজাইতেছিল। তখন বাজনাটা বড় ভাল হইতেছিল না—বেসুর, বেতাল, কি বাজিতে কি বাজে—দেবী অন্যমনা হইতেছিল। তার পরে যাই ছিপ ফিরিল, দেবী অমনি নামিয়া কামরার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। এদিকে রঙ্গরাজ ছিপ হইতে কামরার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া, "রাণীজি-কি জয়"

বলিল। দ্বারে রেসমী পর্দ্দা ফেলা আছে—ভিতর দেখা যায় না। ভিতর হইতে দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ ?"

রঙ্গ। সব মঙ্গল।

দেবী। তোমাদের কেহ জখম হইয়াছে ?

রঙ্গ। কেহ না।

দেবী। তাহাদের কেহ খুন হইয়াছে ?

রঙ্গ। কেহ না—আপনার আজ্ঞামত কাজ হইয়াছে।

দেবী। তাহাদের কেহ জখম হইয়াছে ?

রঙ্গ। দুইটা হিন্দুস্থানী দুই একটা আঁচড় খেয়েছে। কাঁটা ফোটার মত।

দেবী। মাল ?

রঙ্গ। সব আনিয়াছি। মাল এমন কিছু ছিল না।

দেবী। বাবু ?

রঙ্গ। বাবুকে ধরিয়া আনিয়াছি।

দেবী। হাজির কর।

রঙ্গরাজ তখন ব্রজেশ্বরকে ইঙ্গিত করিল। ব্রজেশ্বর ছিপ হইতে উঠিয়া আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে ?" দেবীর যেন বিষম লাগিয়াছে—গলার আওয়াজটা বড় সাফ নয়।

ব্রজেশ্বর যেরূপ লোক, পাঠক এতক্ষণে বুঝিয়াছেন বোধ হয়। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি বালককাল হইতে জানেন না। যে দেবী চৌধুরাণীর নামে উত্তর-বাঙ্গালা কাঁপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিলেন, "মেয়েমানুষকে পুরুষে ভয় করে, এ ত কখনও শুনি নাই। মেয়েমানুষ ত পুরুষের বাঁদী।" হাসিয়া ব্রজেশ্বর দেবীর কথায় উত্তর দিলেন, "পরিচয় লইয়া কি হইবে ? আমার ধনের সঙ্গে আপনাদিগের সম্বন্ধ, তাহা পাইয়াছেন—নামে ত টাকা হইবে না।"

দেবী। হইবে বৈ কি ? আপনি কি দরের লোক, তাহা জানিলে টাকার ঠিকানা হইবে। (তবু গলাটা ধরা ধরা।)

ব্রজ। সেই জন্যই কি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন ?

দেবী। নহিলে আপনাকে আমরা আনিতাম না।

দেবী পর্দ্দার আড়ালে; কেহ দেখিল না যে, দেবী এই কথা বলিবার সময় চোখ মুছিল।

ব্রজ। আমি যদি বলি, আমার নাম দুঃখিরাম চক্রবর্ত্তী, আপনি বিশ্বাস করিবেন কি?

দেবী। না।

ব্রজ। তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

দেবী। আপনি বলেন কি না, দেখিবার জন্য।

ব্রজ। আমার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষাল।

দেবী। না।

ব্রজ। দয়ারাম বক্সী।

দেবী। তাও না।

ব্রজ। ব্রজেশ্বর রায়।

দেবী। হইতে পারে।

এই সময়ে দেবীর কাছে আর একজন স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসিয়া বসিল। বলিল, "গলাটা ধ'রে গেছে যে?"

দেবীর চক্ষের জল আর থাকিল না—বর্ষাকালের ফুটন্ত ফুলের ভিতর যেমন বৃষ্টির জল পোরা থাকে, ডাল নাড়া দিলেই জল ছড়্ ছড়্ করিয়া পড়িয়া যায়, দেবীর চোখে তেমনি জল পোরা ছিল, ডাল নাড়া দিতেই ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িয়া গেল। দেবী তখন ঐ স্ত্রীলোককে কানে কানে বলিল, "আমি আর এ রঙ্গ করিতে পারি না। তুই কথা ক'। সব জানিস্ ত?"

এই বলিয়া দেবী সে কামরা হইতে উঠিয়া অন্য কামরায় গেল। ঐ স্ত্রীলোকটি দেবীর আসন গ্রহণ করিয়া, ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে—ইনি সেই বামনশূন্য বামনী—নিশি ঠাকুরাণী।

নিশি বলিল, "এইবার ঠিক্ বলেছ—তোমার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ব্রজেশ্বরের একটু গোল বাধিল। পর্দ্দার আড়ালে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না—কিন্তু কথার আওয়াজে সন্দেহ হইল যে, যে কথা কহিতেছিল, এ সে বুঝি নয়। তার আওয়াজটা বড় মিঠে লাগিতেছিল—এ বুঝি তত মিঠে নয়। যাই হউক, কথার উত্তরে ব্রজেশ্বর বলিলেন, "যদি আমার পরিচয় জানেন, তবে এই বেলা দরটা চুকাইয়া লউন—আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই। কি দরে আমাকে ছাড়িবেন?"

নিশি। এক কড়া কাণা কড়ি। সঙ্গে আছে কি? থাকে যদি, দিয়া চলিয়া যান।

ব্রজ। আপাততঃ সঙ্গে নাই।

নিশি। বজরা হইতে আনিয়া দিন।

ব্রজ। বজরাতে যাহা ছিল, তাহা আপনার অনুচরেরা লইয়া আসিয়াছে। আর এক কড়া কাণা কড়িও নাই।

নিশি। মাঝিদের কাছে ধার করিয়া আনুন।

ব্রজ। মাঝিরাও কাণা কড়ি রাখে না।

নিশি। তবে যত দিন না আপনার উপযুক্ত মূল্য আনাইয়া দিতে পারেন, তত দিন কয়েদ থাকুন।

ব্রজেশ্বর তার পর শুনিলেন, কামরার ভিতরে আর একজন কে—কণ্ঠে সেও বোধ হয় স্ত্রীলোক—দেবীকে বলিতেছে, "রাণীজি! যদি এক কড়া কাণা কড়িই এই মানুষটার দর হয়, তবে আমি এক কড়া কাণা কড়ি দিতেছি। আমার কাছে উহাকে বিক্রী করুন।"

ব্রজেশ্বর শুনিলেন, রাণী উত্তর করিল, "ক্ষতি কি? কিন্তু মানুষটা নিয়ে তুমি কি করিবে? ব্রাহ্মণ, জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে পারিবে না।"

ব্রজেশ্বর প্রত্যুত্তরও শুনিলেন,—রমণী বলিল, "আমার রাঁধিবার ব্রাহ্মণ নাই। আমাকে রাঁধিয়া দিবে।"

তখন নিশি ব্রজেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুনিলেন,—আপনি বিক্রী হইলেন —আমি কাণা কড়ি পাইয়াছি। যে আপনাকে কিনিল, আপনি তাহার সঙ্গে যান, রাঁধিতে হইবে।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "কই তিনি?"

নিশি। স্ত্রীলোক—বাহিরে যাইবে না, আপনি ভিতরে আসুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর অনুমতি পাইয়া, পর্দ্দা তুলিয়া, কামরার ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, ব্রজেশ্বর তাহাতে বিস্মিত হইল। কামরার কাষ্ঠের দেওয়াল, বিচিত্র চারু চিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে ভক্ত জনে দশভুজা প্রতিমা পূজা করিবার মানসে প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র। শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ; মহিষাসুরের যুদ্ধ; দশ অবতার; অষ্ট নায়িকা; সপ্ত মাতৃকা; দশ মহাবিদ্যা; কৈলাস; বৃন্দাবন; লঙ্কা; ইন্দ্রালয়; নবনারী-কুঞ্জর;

বস্ত্রহরণ ; সকলই চিত্রিত। সেই কামরায় চারি আঙ্গুল পুরু গালিচা পাতা, তাহাতেও কত চিত্র। তার উপর কত উচ্চ মসনদ—মখমলের কামদার বিছানা, তিন দিকে সেইরূপ বালিশ ; সোনার আতরদান, তারই গোলাব-পাশ, সোনার বাটা, সোনার পুষ্পপাত্র—তাহাতে রাশীকৃত সুগন্ধি ফুল ; সোনার আলবোলা ; পোরজরের সট্‌কা—সোনার মুখনলে মতির থোপ ঝুলিতেছে—তাহাতে মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজা আছে। দুই পাশে দুই রূপার ঝাড়, তাহাতে বহুসংখক সুগন্ধি দীপ রূপার পরীর মাথার উপর জ্বলিতেছে ; উপরের ছাদ হইতে একটি ছোট দীপ সোনার শিকলে লট্‌কান আছে। চারি কোণে চারিটি রূপার পুতুল, চারিটি বাতি হাতে করিয়া ধরিয়া আছে।—মসনদের উপর এক জন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে—তাহার মুখের উপর একখানা বড় মিহি জরির বুটাদার ঢাকাই রুমাল ফেলা আছে। মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না—কিন্তু তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণ—আর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ অনুভূত হইতেছে ; কানের গহনা কাপড়ের ভিতর হইতে জ্বলিতেছে—তার অপেক্ষা বিস্তৃত চক্ষের তীব্র কটাক্ষ আরও ঝলসিতেছে। স্ত্রীলোকটি শুইয়া আছে—ঘুমায় নাই।

ব্রজেশ্বর দরবার-কামরায় প্রবেশ করিয়া, শয়ানা সুন্দরীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীজিকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব ?"

সুন্দরী উত্তর করিল, "আমি রাণীজি নই।"

ব্রজেশ্বর দেখিল, এতক্ষণ ব্রজেশ্বর যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, এ তাহার গলার আওয়াজ নহে। অথচ তার আওয়াজ হইতে পারে ; কেন না, বেস্ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এ স্ত্রীলোক কণ্ঠ বিকৃত করিয়া কথা কহিতেছে। মনে করিল, বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা, মায়াবিনী—এত কুহক না জানিলে মেয়েমানুষ হইয়া ডাকাইতি করে ? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম—তিনি কোথায় ?"

সুন্দরী বলিল, "তোমাকে আসিতে অনুমতি দিয়া, তিনি শুইতে গিয়াছেন। রাণীতে তোমার কি প্রয়োজন ?"

ব্র। তুমি কে ?

সুন্দরী। তোমার মুনিব।

ব্র। আমার মুনিব ?

সুন্দরী। জান না, এই মাত্র তোমাকে এক কড়া কাণা কড়ি দিয়া কিনিয়াছি ?

ব্র। সত্য বটে। তা তোমাকেই কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব ?

সুন্দরী। আশীর্ব্বাদের রকম আছে না কি ?

ব্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে আছে। সধবাকে এক রকম আশীর্ব্বাদ করিতে হয়,—বিধবাকে অন্য রূপ। পুত্রবতীকে—

সুন্দরী। আমাকে "শিগ্‌গির মর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ কর।

ব্র। সে আশীর্ব্বাদ আমি কাহাকেও করি না—তোমার এক-শ তিন বছর পরমায়ু হৌক।

সুন্দরী। আমার বয়স পঁচিশ বৎসর। আটাত্তর বৎসর ধরিয়া তুমি আমার ভাত রাঁধিবে?

ব্র। আগে এক দিন ত রাঁধি। খেতে পার ত, না হয় আটাত্তর বৎসর রাঁধিব।

সুন্দরী। তবে বসো—কেমন রাঁধিতে জান, পরিচয় দাও।

ব্রজেশ্বর তখন সেই কোমল গালিচার উপর বসিল। সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

ব্র। তা ত তোমরা সকলেই জান, দেখিতেছি। আমার নাম ব্রজেশ্বর। তোমার নাম কি? গলা অত মোটা করিয়া কথা কহিতেছ কেন? তুমি কি চেনা মানুষ?

সুন্দরী। আমি তোমার মুনিব—আমাকে 'আপনি' 'মশাই' আর 'আজ্ঞে' বলিবে।

ব্র। আজ্ঞে, তাই হইবে। আপনার নাম?

সুন্দরী। আমার নাম পাঁচকড়ি। কিন্তু তুমি আমার ভৃত্য, আমার নাম ধরিতে পারিবে না। বরং বল ত আমিও তোমার নাম ধরিব না।

ব্র। তবে কি বলিয়া ডাকিলে আমি 'আজ্ঞা' বলিব?

পাঁচকড়ি। আমি 'রামধন' বলিয়া তোমাকে ডাকিব। তুমি আমাকে 'মুনিব ঠাকুরুণ' বলিও। এখন তোমার পরিচয় দাও—বাড়ী কোথায়?

ব্র। এক কড়ায় কিনিয়াছ—অত পরিচয়ের প্রয়োজন কি?

পাঁচ। ভাল, সে কথা নাই বলিলে। রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব। রাঢ়ী, না বারেন্দ্র, না বৈদিক?

ব্র। হাতের ভাত ত খাইবেন—যাই হই না।

পাঁচ। তুমি যদি আমার স্বশ্রেণী না হও—তাহা হইলে তোমাকে অন্য কাজে দিব।

ব্র। অন্য কি কাজ?

পাঁচ। জল তুলিবে, কাঠ কাটিবে—কাজের অভাব কি!

ব্র। আমি রাঢ়ী।

পাঁচ। তবে তোমায় জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে হইবে—আমি বারেন্দ্র। তুমি রাঢ়ী—কুলীন, না বংশজ ?

ব্র। এ কথা ত বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ যুটিবে কি ? আমি কৃতদার।

পাঁচ। কৃতদার ? কয় সংসার করিয়াছেন ?

ব্র। জল তুলিতে হয়—জল তুলিব—অত পরিচয় দিব না।

তখন পাঁচকড়ি দেবী রাণীকে ডাকিয়া বলিল, "রাণীজি ! বামুন ঠাকুর বড় অবাধ্য। কথার উত্তর দেয় না।"

নিশি অপর কক্ষ হইতে উত্তর করিল, "বেত লাগাও।"

তখন দেবীর একজন পরিচারিকা সপাৎ করিয়া একগাছা লিক্‌লিকে সরু বেত পাঁচকড়ির বিছানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি বেত পাইয়া ঢাকাই রুমালের ভিতর মধুর অধর চারু দন্তে টিপিয়া বিছানায় বার দুই বেতগাছা আছড়াইল। ব্রজেশ্বরকে বলিল, "দেখিয়াছ ?"

ব্রজেশ্বর হাসিল। বলিল, "আপনারা সব পারেন। কি বলিতে হইবে বলিতেছি।"

পাঁচ। তোমার পরিচয় চাই না—পরিচয় লইয়া কি হইবে ? তোমার রান্না ত খাইব না। তুমি আর কি কাজ করিতে পার, বল ?

ব্র। হুকুম করুন।

পাঁচ। জল তুলিতে জান ?

ব্র। না।

পাঁচ। কাঠ কাটিতে জান ?

ব্র। না।

পাঁচ। বাজার করিতে জান ?

ব্র। মোটামুটি রকম।

পাঁচ। মোটামুটিতে চলিবে না। বাতাস করিতে জান ?

ব্র। পারি।

পাঁচ। আচ্ছা, এই চামর নাও, বাতাস কর।

ব্রজেশ্বর চামর লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। পাঁচকড়ি বলিল, "আচ্ছা, একটা কাজ জান ? পা টিপিতে জান ?"

ব্রজেশ্বরের দুরদৃষ্ট, তিনি পাঁচকড়িকে মুখরা দেখিয়া, একটি ছোট রকমের রসিকতা করিতে গেলেন। এই দস্যুনেত্রীদিগের কোন রকমে খুসি করিয়া মুক্তি লাভ করেন, সে অভিপ্রায়ও ছিল। অতএব পাঁচকড়ির কথার উত্তরে বলিলেন, "তোমাদের মত সুন্দরীর পা টিপিব, সে ত ভাগ্য—"

"তবে একবার টেপ না" বলিয়া অমনি পাঁচকড়ি আল্‌তাপরা রাঙ্গা পাখানি ব্রজেশ্বরের উরুর উপর তুলিয়া দিল।

ব্রজেশ্বর নাচার—আপনি পা টেপার নিমন্ত্রণ লইয়াছেন, কি করেন। ব্রজেশ্বর কাজেই দুই হাতে পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিলেন, "এ কাজটা ভাল হইতেছে না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি।"

তখন দুষ্টা পাঁচকড়ি ডাকিল, "রাণীজি! একবার এদিকে আসুন।"

দেবী আসিতেছে, ব্রজেশ্বর পায়ের শব্দ পাইল। পা নামাইয়া দিল। পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল, "সে কি? পিছাও কেন?" পাঁচকড়ি সহজ গলায় কথা কহিয়াছিল। ব্রজেশ্বর বড় বিস্মিত হইলেন,—"সে কি? এ গলা ত চেনা গলাই বটে।" সাহস করিয়া ব্রজেশ্বর পাঁচকড়ির মুখঢাকা রুমালখানা খুলিয়া লইলেন। পাঁচকড়ি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি? এ কি? তুমি—তুমি সাগর?"

পাঁচকড়ি বলিল, "আমি সাগর। গঙ্গা নই—যমুনা নই—বিল নই—খাল নই—সাক্ষাৎ সাগর। তোমার বড় অভাগ্য—না? যখন পরের স্ত্রী মনে করিয়াছিলে, তখন বড় আহ্লাদ করিয়া পা টিপিতেছিলে, আর যখন ঘরের স্ত্রী হইয়া পা টিপিতে বলিয়াছিলাম, তখন রাগে গর্‌গর্ করিয়া চলিয়া গেলে! যাক্, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। তুমি আমার পা টিপিয়াছ। এখন আমার মুখপানে চাহিয়া দেখিতে পার, আমায় ত্যাগ কর, আর পায়ে রাখ—এখন জানিলে, আমি যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর কিয়ৎক্ষণ বিহ্বল হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "সাগর! তুমি এখানে কেন?" সাগর বলিল, "সাগরের স্বামী! তুমিই বা এখানে কেন?"

ব্র। তাই কি? আমি কয়েদী, তুমিও কি কয়েদী? আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে। তোমাকেও কি ধরিয়া আনিয়াছে?

সাগর। আমি কয়েদী নই, আমাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই। আমি ইচ্ছাক্রমে দেবী রাণীর সাহায্য লইয়াছি। তোমাকে দিয়া আমার পা টিপাইব বলিয়া দেবী রাণীর রাজ্যে বাস করিতেছি।

তখন নিশি আসিল। ব্রজেশ্বর তাহার বস্ত্রালঙ্কারে জাঁকজমক দেখিয়া মনে করিল, "এই দেবী চৌধুরাণী।" ব্রজেশ্বর সম্ভ্রম রাখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশি বলিল, "স্ত্রীলোক ডাকাইত হইলেও তাহার অত সম্মান করিতে নাই—আপনি বসুন। এখন শুনিলেন, কেন আপনার বজরায় আমরা ডাকাইতি করিয়াছি? এখন সাগরের পণ উদ্ধার হইয়াছে; এখন আপনাতে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার নৌকায় ফিরিয়া যাইলে কেহ আটক করিবে না। আপনার জিনিষপত্র এক কপর্দ্দক কেহ লইবে না, সব আপনার বজরায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। কিন্তু এই একটা কপর্দ্দক—এই পোড়ারমুখী সাগর, ইহার কি হইবে? এ কি বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? ইহাকে আপনি লইয়া যাইবেন কি? মনে করুন, আপনি উহার এক কড়ার কেনা গোলাম।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! ব্রজেশ্বর বিহ্বল হইল। তবে ডাকাইতি সব মিথ্যা, এরা ডাকাইত নয়! ব্রজেশ্বর ক্ষণেক ভাবিল, ভাবিয়া শেষে বলিল, "তোমরা আমায় বোকা বানাইলে। আমি মনে করিয়াছিলাম, দেবী চৌধুরাণীর দলে আমার বজরায় ডাকাইতি করিয়াছে।"

তখন নিশি বলিল, "সত্য সত্যই দেবী চৌধুরাণীর এই বজরা। দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন,"—কথা শেষ হইতে না হইতেই ব্রজেশ্বর বলিল, "'দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন'—তবে আপনি কি দেবী রাণী নন?"

নিশি। আমি দেবী নই। আপনি যদি রাণীজিকে দেখিতে চান, তিনি দর্শন দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, তা আগে শুনুন। আমরা সত্য সত্যই ডাকাইতি করি, কিন্তু আপনার উপর ডাকাইতি করিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা। এখন সাগর বাড়ী যায় কি প্রকারে? প্রতিজ্ঞা ত রক্ষা হইল।

ব্র। আসিল কি প্রকারে?

নিশি। রাণীজির সঙ্গে।

ব্র। আমিও ত সাগরের পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—সেখান হইতেই আসিতেছি। কই, সেখানে ত রাণীজিকে দেখি নাই?

নিশি। রাণীজি আপনার পরে সেখানে গিয়াছিলেন।

ব্র। তবে ইহার মধ্যে এখানে আসিলেন কি প্রকারে?

নিশি। আমাদের ছিপ দেখিয়াছেন ত? পঞ্চাশ বোটে।

ব্র। তবে আপনারাই কেন ছিপে করিয়া সাগরকে রাখিয়া আসুন না?

নিশি। তাতে একটু বাধা আছে। সাগর কাহাকে না বলিয়া রাণীর সঙ্গে আসিয়াছে—এজন্য অন্য লোকের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে, সবাই জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় গিয়াছিলে? আপনার সঙ্গে ফিরিয়া গেলে উত্তরের ভাবনা নাই।

ব্র। ভাল, তাই হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছিপ হুকুম করিয়া দিন।

"দিতেছি" বলিয়া নিশি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

তখন সাগরকে নির্জ্জনে পাইয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "সাগর! তুমি কেন এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে?"

মুখে অঞ্চল দিয়া—এবার ঢাকাই রুমাল নহে—কাপড়ের যেখানটা হাতে উঠিল, সেইখানটা মুখে ঢাকা দিয়া সাগর কাঁদিল—সেই মুখরা সাগর টিপিয়া টিপিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, চুপি চুপি ভারি কান্না কাঁদিল। চুপি চুপি—পাছে দেবী শোনে।

কান্না থামিলে ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "সাগর! তুমি আমায় ডাকিলে না কেন? ডাকিলেই সব মিটিয়া যাইত।"

সাগর কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া, চক্ষু মুছিয়া বলিল, "কপালের ভোগ, কিন্তু আমি নাই ডাকিয়াছি—তুমিই বা আসিলে না কেন?"

ব্র। তুমি আমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলে—না ডাকিলে যাই কি বলিয়া?

এই সকল কথাবার্ত্তা যথাশাস্ত্র সমাপন হইলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "সাগর! তুমি ডাকাইতের সঙ্গে কেন আসিলে?"

সাগর বলিল, "দেবী—সম্বন্ধে আমার ভগিনী হয়, পূর্ব্বে জানা শুনা ছিল। তুমি চলিয়া আসিলে, সে গিয়া আমার বাপের বাড়ী উপস্থিত হইল। আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া সে বলিল, 'কাঁদ কেন ভাই—তোমার শ্যামচাঁদকে আমি বেঁধে এনে দিব। আমার সঙ্গে দুই দিনের তরে এসো।' তাই আমি আসিলাম। দেবীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবার আমার বিশেষ কারণ আছে। তোমার সঙ্গে আমি পলাইয়া চলিলাম, এই কথা আমি চাকরাণীকে বলিয়া আসিয়াছি। তোমার জন্য এই সব আল-বোলা, সট্‌কা প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়াছি—একবার তামাক টামাক খাও, তার পর যেও।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "কই, যে মালিক, সে ত কিছু বলে না।"

তখন সাগর দেবীকে ডাকিল। দেবী আসিল না—নিশি আসিল।

নিশিকে দেখিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "এখন আপনি ছিপ হুকুম করিলেই যাই।"

নিশি। ছিপ তোমারই। কিন্তু দেখ, তুমি রাণীর বোনাই—কুটুম্বকে স্বস্থানে পাইয়া আমরা আদর করিলাম না—কেবল অপমানই করিলাম, এ বড় দুঃখ থাকে। আমরা ডাকাইত বলিয়া আমাদের কি হিন্দুয়ানি নাই?

ব্র। কি করিতে বলেন?

নিশি। প্রথমে উঠিয়া ভাল হইয়া বসো।

নিশি মসনদ দেখাইয়া দিল। ব্রজেশ্বর শুধু গালিচায় বসিয়াছিল। বলিল, "কেন, আমি বেস্ বসিয়া আছি।"

তখন নিশি সাগরকে বলিল, "ভাই, তোমার সামগ্রী তুমি তুলিয়া বসাও। জান, আমরা পরের দ্রব্য ছুঁই না।" হাসিয়া বলিল, "সোনা রূপা ছাড়া।"

ব্র। তবে আমি কি পিতল কাঁসার দলে পড়িলাম?

নিশি। আমি ত তা মনে করি—পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকিলে ঘর সংসার চলে না—তাই রাখিতে হয়। কথায় কথায় সকৃড়ি হয়—মাজিয়া ঘষিয়া ধুইয়া, ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়। নে ভাই সাগর, তোর ঘটি বাটি তফাৎ কর—কি জানি, যদি সকৃড়ি হয়।

ব্র। একে ত পিতল কাঁসা—তার মধ্যে আবার ঘটি বাটি! ঘড়াটা গাড়ুটার মধ্যে গণ্য হইবারও যোগ্য নই?

নিশি। আমি ভাই বৈষ্ণবী, তৈজসের ধার ধারি না—আমাদের দৌড় মালসা পর্য্যন্ত। তৈজসের খবর সাগরকে জিজ্ঞাসা কর।

সাগর। আমি ঠিক কথা জানি। পুরুষমানুষ তৈজসের মধ্যে কলসী। সদাই অন্তঃশূন্য—আমরা যাই গুণবতী, তাই জল পূরিয়া পূর্ণকুম্ভ করিয়া রাখি।

নিশি বলিল, "ঠিক বলিয়াছিস্—তাই মেয়েমানুষে এ জিনিষ গলায় বাঁধিয়া সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে।—নে ভাই, তোর কলসী, কলসী-পীড়ির উপর তুলিয়া রাখ্।"

ব্র। কলসী মানে মানে আপনি পীড়ির উপর উঠিতেছে।

এই কথা বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনি মসনদের উপর উঠিয়া বসিল। হঠাৎ দুই দিক্ হইতে দুই জন পরিচারিকা—সুন্দরী যুবতী, বহুমূল্য বসন-ভূষণ-ভূষিতা—দুইটা সোনা-বাঁধা চামর হাতে করিয়া, ব্রজেশ্বরের দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ্ঞা না পাইয়াও তাহারা ব্যজন

করিতে লাগিল। নিশি তখন সাগরকে বলিল, "যা, এখন তোর স্বামীর জন্য আপন হাতে তামাকু সাজিয়া লইয়া আয়।"

সাগর ক্ষিপ্রহস্তে সোনার আলবোলার উপর হইতে কলিকা লইয়া গিয়া, শীঘ্র মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া আনিল। আলবোলায় চড়াইয়া দিল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "আমাকে একটা হুঁকায় নল করিয়া তামাকু দাও।"

নিশি বলিল, "কোন শঙ্কা নাই—ঐ আলবোলা উৎসৃষ্ট নয়। কেহ কখন উহাতে তামাকু খায় নাই। আমরা কেহ তামাকু খাই না।"

ব্র। সে কি? তবে এ আলবোলা কেন?

নিশি। দেবীর রাণীগিরির দোকানদারি—

ব্র। তা হৌক—আমি যখন আসিলাম, তখন যে তামাকু সাজা ছিল—কে খাইতেছিল?

নিশি। কেহ না—সাজাও দোকানদারি—

ঐ আলবোলা সেই দিন বাহির হইয়াছে—ঐ তামাকু সেই দিন কেনা হইয়া আসিয়াছে—সাগরের স্বামী আসিবে বলিয়া। ব্রজেশ্বর মুখনলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—অভুক্ত বোধ হয়। তখন ব্রজেশ্বর ধূমপানের অনির্ব্বচনীয় সুখে মগ্ন হইলেন। নিশি তখন সাগরকে বলিল, "তুই পোড়ারমুখী, আর দাঁড়াইয়া কি করিস্—পুরুষমানুষে হুঁকার নল মুখে করিলে আর কি স্ত্রী পরিবারকে মনে ঠাঁই দেয়? যা, তুই গোটাকত পান সাজিয়া আন। দেখিস্—আপন হাতে পান সাজিয়া আনিস্—পরের সাজা আনিস্ না—পারিস্ যদি একটু ওষুধ করিস্।"

সাগর বলিল, "আপন হাতেই সাজা আছে—ওষুধ জানিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?"

এই বলিয়া সাগর চন্দন কর্পূর চুয়া গোলাবে সুগন্ধি পানের রাশি সোনার বাটা পূরিয়া আনিল। তখন নিশি বলিল, "তোর স্বামীকে অনেক বকেছিস্—কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।"

ব্রজেশ্বরের মুখ শুকাইল, "সর্ব্বনাশ! এত রাত্রে জলখাবার! ঐটি মাফ করিও।"

কিন্তু কেহ তাহার কথা শুনিল না—সাগর বড় তাড়াতাড়ি আর এক কামরায় ঝাঁট দিয়া, জলের হাতে মুছিয়া, একখানা বড় ভারী পুরু আসন পাতিয়া চারি পাঁচখানা রূপার থালে সামগ্রী সাজাইয়া ফেলিল। স্বর্ণ-পাত্রে উত্তম সুগন্ধি শীতল জল রাখিয়া দিল। জানিতে পারিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে বলিল, "ঠাঁই হইয়াছে—উঠ।" ব্রজেশ্বর উঁকি মারিয়া দেখিয়া, নিশির কাছে যোড়হাত করিল। বলিল, "ডাকাইতি করিয়া ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিয়াছ—সে অত্যাচার সহিয়াছে—কিন্তু এত রাত্রে এ অত্যাচার সহিবে না—দোহাই।"

স্ত্রীলোকেরা মার্জ্জনা করিল না। ব্রজেশ্বর অগত্যা কিছু খাইল। সাগর তখন নিশিকে বলিল, "ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।" নিশি বলিল, "দক্ষিণা রাণী স্বয়ং দিবেন। এসো ভাই, রাণী দেখিবে এসো।" এই বলিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে আর এক কামরায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশি ব্রজেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া দেবীর শয্যাগৃহে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, শয়নঘর দরবার কামরার মত অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত। বেশীর ভাগ, একখানা সুবর্ণমণ্ডিত মুক্তার ঝালরযুক্ত ক্ষুদ্র পালঙ্ক আছে। কিন্তু ব্রজেশ্বরের সে সকল দিকে চক্ষু ছিল না। এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী প্রথিতনাম্নী দেবীকে দেখিবেন। দেখিলেন, কামরার ভিতর অনাবৃত কাষ্ঠের উপর বসিয়া, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোক। নিশি ও সাগরে, ব্রজেশ্বর যে চাঞ্চল্যময়তা দেখিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। এ স্থিরা, ধীরা—নিম্নদৃষ্টি, লজ্জাবনতমুখী। নিশি ও সাগর, বিশেষতঃ নিশি সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারমণ্ডিতা, বহুমূল্য বসনে আবৃতা,—কিন্তু ইহার তা কিছুই নাই। দেবী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের ভরসায় বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হইলে, দেবী সে সকলই ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিয়া, হাতে কেবল একখানি মাত্র সামান্য অলঙ্কার রাখিয়া ব্রজেশ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে নিশির বুদ্ধিতে দেবী ভ্রমে পড়িয়াছিল; শেষে বুঝিতে পারিয়া আপনা আপনি তিরস্কার করিয়াছিল; "ছি! ছি! ছি! কি করিয়াছি! ঐশ্বর্য্যের ফাঁদ পাতিয়াছি!" তাই এ বেশ পরিবর্ত্তন।

ব্রজেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর প্রবেশ করিলে, দেবী গাত্রোত্থান করিয়া ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিল। দেখিয়া ব্রজেশ্বর আরও বিস্মিত হইল—কই, আর কেহ ত প্রণাম করে নাই? দেবী তখন ব্রজেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্রজেশ্বর দেখিল, যথার্থ দেবীমূর্ত্তি! এমন আর কখন দেখিয়াছে কি? হ্যাঁ, ব্রজ আর একবার এমনই দেখিয়াছিল। সে আরও মধুর,—কেন না, দেবীমূর্ত্তি তখন বালিকার মূর্ত্তি—ব্রজেশ্বরের তখন প্রথম যৌবন। হায়! এ যদি সেই হইত! এ মুখ দেখিয়া, ব্রজেশ্বরের সে মুখ মনে পড়িল, কিন্তু দেখিলেন, এ মুখ সে মুখ নহে। তার কি কিছুই এতে নাই? আছে বৈকি—কিছু আছে। ব্রজেশ্বর তাই অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। সে ত অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে—

তবে মানুষে মানুষে কখন কখন এমন সাদৃশ্য থাকে যে, এক জনকে দেখিলে আর এক জনকে মনে পড়ে। এ তাই না ব্রজ ?

ব্রজ তাই মনে করিল। কিন্তু সেই সাদৃশ্যেই হৃদয় ভরিয়া গেল—ব্রজের চক্ষে জল আসিল, পড়িল না। তাই দেবী সে জল দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে আজ একটা কাণ্ডকারখানা হইয়া যাইত। দুইখানা মেঘেই বৈদ্যুতি ভরা।

প্রণাম করিয়া, নিম্ননয়নে দেবী বলিতে লাগিল, "আমি আপনাকে আজ জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বড় কষ্ট দিয়াছি। কেন এমন কুকর্ম্ম করিয়াছি, শুনিয়াছেন। আমার অপরাধ লইবেন না।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "আমার উপকারই করিয়াছেন।" বেশী কথা বলিবার ব্রজেশ্বরের শক্তি নাই।

দেবী আরও বলিল, "আপনি আমার এখানে দয়া করিয়া জলগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। আপনি কুলীন—আপনারও মর্য্যাদা রাখা আমার কর্ত্তব্য। আপনি আমার কুটুম্ব। যাহা মর্য্যাদাস্বরূপ আমি আপনাকে দিতেছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

ব্র। স্ত্রীর মত কোন্ ধন ? আপনি তাই আমাকে দিয়াছেন। ইহার বেশী আর কি দিবেন ?

ও ব্রজেশ্বর! কি বলিলে ? স্ত্রীর মত ধন আর নাই ? তবে বাপ বেটায় মিলিয়া প্রফুল্লকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে কেন ?

পালঙ্কের পাশে একটি রূপার কলসী ছিল—তাহা টানিয়া বাহির করিয়া, দেবী ব্রজেশ্বরের নিকটে রাখিল, বলিল, "ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে।"

ব্রজ। আপনার বজরায় এত সোনা রূপার ছড়াছড়ি যে, এই কলসীটা নিতে আপত্তি করিলে, সাগর আমায় বকিবে। কিন্তু একটা কথা আছে—

কথাটা কি—দেবী বুঝিল, বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ চুরি ডাকাইতির নহে। আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে—শুনিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রহণপক্ষে কোন সংশয় করিবেন না।"

ব্রজেশ্বর সম্মত হইল—কুলীনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের "বিদায়" বা "মর্য্যাদা" গ্রহণে লজ্জা ছিল না—এখনও বোধ হয় নাই। কলসীটা বড় ভারী ঠেকিল, ব্রজেশ্বর সহজে তুলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এ কি এ ? কলসীটা নিরেট না কি ?"

দেবী। টানিবার সময়ে উহার ভিতর শব্দ হইয়াছিল—নিরেট সম্ভবে না।

ব্র। তাই ত? এতে কি আছে?

কলসীতে ব্রজেশ্বর হাত পুরিয়া তুলিল—মোহর। কলসী মোহরে পরিপূর্ণ।

ব্র। এগুলি কিসে ঢালিয়া রাখিব?

দেবী। ঢালিয়া রাখিবেন কেন? এগুলি সমস্তই আপনাকে দিয়াছি।

ব্র। কি?

দেবী। কেন?

ব্র। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শ।

ব্র। তেত্রিশ শ মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। সাগর আপনাকে টাকার কথা বলিয়াছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনিয়াছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্র। তাই দিতেছেন?

দেবী। টাকা আমার নহে, আমার দান করিবার অধিকার নাই। টাকা দেবতার, দেবত্র আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্র সম্পত্তি হইতে আপনাকে এই টাকা কর্জ্জ দিতেছি।

ব্র। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বোধ হয়, চুরি ডাকাতি করিয়াও যদি আমি এ টাকা সংগ্রহ করি, তাহা হইলেও অধর্ম্ম হয় না; কেন না, এ টাকা নহিলে আমার বাপের জাতি রক্ষা হয় না। আমি এ টাকা লইব। কিন্তু কবে পরিশোধ করিতে হইবে?

দেবী। দেবতার সম্পত্তি, দেবতা পাইলেই হইল। আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে পর ঐ টাকার আসল আর এক মোহর সুদ দেবসেবায় ব্যয় করিবেন।

ব্র। সে আমারই ব্যয় করা হইবে। সে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত নহি।

দেবী। আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপে পরিশোধ করিবেন।

ব্র। আমার টাকা যুটিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

দেবী। আপনার লোক কেহ আমার কাছে আসিবে না, আসিতেও পারিবে না।

ব্র। আমি নিজে টাকা লইয়া আসিব।

দেবী। কোথায় আসিবেন? আমি এক স্থানে থাকি না।

ব্র। যেখানে বলিয়া দিবেন।

দেবী। দিন ঠিক করিয়া বলিলে, আমি স্থান ঠিক করিয়া বলিতে পারি।

ব্র। আমি মাঘ ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু একটু বেশী করিয়া সময় লওয়া ভাল। বৈশাখ মাসে টাকা দিব।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আনিবেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকিব। সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের পর আসিলে আমার দেখা পাইবেন না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইলেন। তখন দেবী পরিচারিকাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, মোহরের ঘড়া ছিপে উঠাইয়া দিয়া আইসে। পরিচারিকারা ঘড়া ছিপে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বরও দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ছিপে যাইতেছিলেন। তখন দেবী নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা বাকি আছে। এ ত কর্জ্জ দিলাম—মর্য্যাদা দিলাম কই?"

ব্র। কলসীটা মর্য্যাদা।

দেবী। আপনার যোগ্য মর্য্যাদা নহে। যথাসাধ্য মর্য্যাদা রাখিব।

এই বলিয়া দেবী আপনার আঙ্গুল হইতে একটা আঙ্গটি খুলিল। ব্রজেশ্বর তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সহাস্য বদনে হাত পাতিলেন। দেবী হাতের উপর আঙ্গটি ফেলিয়া দিল না—ব্রজেশ্বরের হাতখানি ধরিল—আপনি আঙ্গটি পরাইয়া দিবে।

ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোলমাল হইয়া গেল, জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল না। শরীরে কাঁটা দিল—ভিতরে যেন অমৃতস্রোত ছুটিল। জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর, হাতটা সরাইয়া লইতে ভুলিয়া গেল। বিধাতা এক এক সময়ে এমনই বাদ সাধেন যে, সময়ে আপন কাজ ভুলিয়া যাইতে হয়।

তা, দেবী সেই মানসিক গোলযোগের সময় ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে ধীরে ধীরে আঙ্গটি পরাইতে লাগিল। সেই সময়ে কোঁটা দুই তপ্ত জল ব্রজেশ্বরের হাতের উপর পড়িল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, দেবীর মুখ চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। কি রকমে কি হইল, বলিতে পারি না, ব্রজেশ্বর ত জিতেন্দ্রিয়—কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোল বাধিয়াছিল। সেই আর একখানা মুখ মনে পড়িল—বুঝি, সে মুখে সেই রাত্রে এমনই অশ্রুধারা বহিয়াছিল—সে চোখের জল মোছানটাও বুঝি মনে পড়িল; এই সেই, সেই এই, কি এমনই একটা কি গোলমাল বাধিয়া গেল। ব্রজেশ্বর কিছু না বুঝিয়া—কেন জানি না—দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাতে ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখখানা প্রফুল্লের মত দেখিল। বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে—আ ছি ছি! ব্রজেশ্বর! আবার!

তখন ব্রজেশ্বরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করিলাম! এ কি প্রফুল্ল? সে যে দশ বৎসর মরিয়াছে! ব্রজেশ্বর উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া, একেবারে ছিপে গিয়া উঠিল। সাগরকে সঙ্গে লইয়াও গেল না। সাগর "ধর! ধর! আসামী পলায়!" বলিয়া, পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া ছিপে উঠিল। ছিপ খুলিয়া ব্রজেশ্বরকে ও ব্রজেশ্বরের দুই রত্নাধার—একটি সাগর, আর একটি কলসী—ব্রজেশ্বরের নৌকায় পৌঁছাইয়া দিল।

এদিকে নিশি আসিয়া দেবীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। নিশি তাহাকে উঠাইয়া বসাইল—চোখের জল মুছাইয়া দিল—সুস্থির করিল। তখন নিশি বলিল, "এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস? ভগবদ্বাক্য কোথায় মা, এখন?"

দেবী চুপ করিয়া রহিল। নিশি বলিল, "ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।"

দেবী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তুমি যমের বাড়ী যাও।"

নিশি। আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার উপর যমের অধিকার নাই। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।

দেবী। সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না। এখন বজরা খুলিয়া দিতে বল। চার পাল উঠাও।

তখন সেই জাহাজের মত বজরা চারিখানা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর আপনার নৌকায় আসিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। সাগরের সঙ্গে কথা কহে না। দেখিল, দেবীর বজরা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল। তখন ব্রজেশ্বর সাগরকে জিজ্ঞাসা করিল, "বজরা কোথায় গেল?"

সাগর বলিল, "তা দেবী ভিন্ন আর কেহ জানে না। সে সকল কথা দেবী আর কাহাকেও বলে না।"

ব্র। দেবী কে?

সা। দেবী দেবী।

ব্র। তোমার কে হয় ?

সা। ভগিনী।

ব্র। কি রকম ভগিনী ?

সা। জ্ঞাতি।

ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। মাঝিদিগকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা বড় বজরার সঙ্গে যাইতে পার ?" মাঝিরা বলিল, "সাধ্য কি! ও নক্ষত্রের মত ছুটিয়াছে।" ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। সাগর ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, ব্রজেশ্বর বজরা খুলিয়া চলিল।

সূর্য্যোদয় হইলে, সাগর আসিয়া ব্রজেশ্বরের কাছে বসিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী কি ডাকাতি করে ?"

সা। তোমার কি বোধ হয় ?

ব্র। ডাকাতির সমান ত সব দেখিলাম—ডাকাতি করিলে করিতে পারে, তাও দেখিলাম। তবু বিশ্বাস হয় না যে, ডাকাতি করে।

সা। তবু কেন বিশ্বাস হয় না ?

ব্র। কে জানে। ডাকাতি না করিলেই বা এত ধন কোথায় পাইল ?

সা। কেহ বলে, দেবী দেবতার বরে এত ধন পাইয়াছে ; কেহ বলে, মাটির ভিতর পোঁতা টাকা পাইয়াছে ; কেহ বলে, দেবী সোনা করিতে জানে।

ব্র। দেবী কি বলে ?

সা। দেবী বলে, এক কড়াও আমার নয়, সব পরের।

ব্র। পরের ধন এত পাইল কোথায় ?

সা। তা কি জানি।

ব্র। পরের ধন হ'লে অত আমিরি করে ? পরে কিছু বলে না ?

সা। দেবী কিছু আমিরি করে না। খুদ খায়, মাটিতে শোয়, গড়া পরে। কাল যা দেখ্‌লে, সে সকল তোমার আমার জন্য মাত্র,—কেবল দোকানদারি। তোমার হাতে ও কি ?

সাগর ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে নূতন আঙ্গটি দেখিল।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কাল দেবীর নৌকায় জলযোগ করিয়াছিলাম বলিয়া, দেবী আমাকে এই আঙ্গটি মর্য্যাদা দিয়াছে।"

সা। দেখি।

ব্রজেশ্বর আঙ্গটি খুলিয়া দেখিতে দিল। সাগর হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। বলিল, "ইহাতে দেবী চৌধুরাণীর নাম লেখা আছে।"

ব্র। কই?

সা। ভিতরে—ফারসীতে।

ব্র। (পড়িয়া) এ কি এ? এ যে আমার নাম—আমার আঙ্গটি? সাগর! তোমাকে আমার দিব্য, যদি তুমি আমার কাছে সত্য কথা না কও। আমায় বল, দেবী কে?

সা। তুমি চিনিতে পার নাই, সে কি আমার দোষ? আমি ত এক দণ্ডে চিনিয়াছিলাম।

ব্র। কে! কে! দেবী কে?

সা। প্রফুল্ল।

আর ব্রজেশ্বর কথা কহিল না। সাগর দেখিল, প্রথমে ব্রজেশ্বরের শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল, তার পর একটা অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের চিহ্ন—উচ্ছলিত সুখের তরঙ্গ, শরীরে দেখা দিল। মুখ প্রভাময়, নয়ন উজ্জ্বল অথচ জলপ্লাবিত, দেহ উন্নত, কান্তি স্ফূর্ত্তিময়ী। তার পরই আবার সাগর দেখিল, সব যেন নিবিয়া গেল। বড় ঘোরতর বিষাদ আসিয়া যেন সেই প্রভাময় কান্তি অধিকার করিল। ব্রজেশ্বর বাক্যশূন্য, স্পন্দহীন, নিমেষশূন্য। ক্রমে সাগরের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজেশ্বর চক্ষু মুদিল। দেহ অবসন্ন হইল; ব্রজেশ্বর সাগরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। সাগর কাতর হইয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। কিছুই উত্তর পাইল না; একবার ব্রজেশ্বর বলিল, "প্রফুল্ল ডাকাত! ছি!"

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর ও সাগরকে বিদায় দিয়া, দেবী চৌধুরাণী—হায়! কোথায় গেল দেবী? কই সে বেশভূষা, ঢাকাই শাড়ী, সোনাদানা, হীরা মুক্তা পান্না—সব কোথায় গেল? দেবা সব ছাড়িয়াছে—সব একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে। দেবী কেবল একখানা গড়া পরিয়াছে—হাতে কেবল একগাছা কড়। দেবী নৌকার এক পাশে বজরার শুধু তক্তার উপর একখানা চট পাতিয়া শয়ন করিল। ঘুমাইল কি না, জানি না।

প্রভাতে বজরা বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া লাগিয়াছে দেখিয়া, দেবী নদীর জলে নামিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই রহিল—সেই চটের মত মোটা শাড়ী। কপাল ও বুক

গঙ্গামৃত্তিকায় চর্চ্চিত করিল—রুক্ষ, ভিজা চুল এলাইয়া দিল—তখন দেবীর যে সৌন্দর্য্য বাহির হইল, গত রাত্রির বেশভূষা, ঝাঁকজমক, হীরা মতি চাঁদনি বা রাণীগিরিতে তাহা দেখা যায় নাই। কাল দেবীকে রত্নাভরণে রাজরাণীর মত দেখাইয়াছিল—আজ গঙ্গামৃত্তিকার সজ্জায় দেবতার মত দেখাইতেছে। যে সুন্দর, সে মাটি ছাড়িয়া হীরা পরে কেন?

দেবী এই অনুপম বেশে একজন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া তীরে তীরে চলিল—বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেক দূর গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি—কথায় কথায় ডাকাইতের কথা বলিতেছি—ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাইতের ত কথাই নাই। পাঠকের স্মরণ থাকে যেন যে, ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্‌কে যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্ব্বে আর কখন তত করিতে হয় নাই। এ সকল অরাজকতার সময়ে ডাকাইতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্ব্বল বা গণ্ডমূর্খ, তাহারাই "ভাল মানুষ" হইত। ডাকাইতিতে তখন কোন নিন্দা বা লজ্জা ছিল না।

দেবী জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াও অনেক দূর গেল। একটা গাছের তলায় পৌঁছিয়া পরিচারিকাকে বলিল, "দিবা, তুই এখানে ব'স্। আমি আসিতেছি। এ বনে বাঘ ভালুক বড় অল্প। আসিলেও তোর ভয় নাই। লোক পাহারায় আছে।" এই বলিয়া দেবী সেখান হইতে আরও গাঢ়তর জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। অতি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটা সুরঙ্গ। পাথরের সিঁড়ি আছে। যেখানে নামিতে হয়, সেখানে অন্ধকার—পাথরের ঘর। পূর্ব্বকালে বোধ হয় দেবালয় ছিল—এক্ষণে কাল সহকারে চারি পাশে মাটি পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাতে নামিবার সিঁড়ি গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। দেবী অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিল।

সেই ভূগর্ভস্থ মন্দিরে মিট্ মিট্ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তার আলোতে এক শিবলিঙ্গ দেখা গেল। এক ব্রাহ্মণ সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া তাহার পূজা করিতেছিল। দেবী শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণের কিছু দূরে বসিলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণ পূজা সমাপনপূর্ব্বক, আচমন করিয়া দেবীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিল, "মা! কাল রাত্রে—তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি ডাকাইতি করিয়াছ না কি?"

দেবী বলিল, "আপনার কি বিশ্বাস হয় ?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "কি জানি ?"

ব্রাহ্মণ আর কেহই নহে ; আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভবানী ঠাকুর।

দেবী বলিল, "কি জানি কি, ঠাকুর ? আপনি কি আমায় জানেন না ? দশ বৎসর আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলাম। লোকে জানে, যত ডাকাইতি হয়, সব আমিই করি। তথাপি এক দিনের জন্য এ কাজ আমা হইতে হয় নাই—তা আপনি বেশ জানেন। তবু বলিলেন, 'কি জানি ?'"

ভবানী। রাগ কর কেন ? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাইতি করি, তা মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে, এক দিনের তরেও ঐ কাজ করিতাম না। তুমিও এ কাজ মন্দ মনে কর না, বোধ হয়—কেন না, তাহা হইলে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরিতেছে। আমি আপনার কথায় এত দিন ভুলিয়া-ছিলাম—আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক কি ? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখিব না।

ভবানী। সে কি ? যা এত দিন বুঝাইয়া দিয়াছি, তাই কি আবার তোমায় বুঝাইতে হইবে ? যদি আমি এ সকল ডাকাইতির ধনের এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিতাম, তবে মহাপাতক বটে। কিন্তু তুমি ত জান যে, কেবল পরকে দিবার জন্য ডাকাইতি করি। যে ধার্ম্মিক, যে সৎপথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করে, যাহার ধনহানি হইলে ভরণপোষণের কষ্ট হইবে, রঙ্গরাজ কি আমি কখন তাহাদের এক পয়সাও লই নাই। যে জুয়াচোর, দাগাবাজ, পরের ধন কাড়িয়া বা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, আমরা তাহাদের উপর ডাকাইতি করি। করিয়া এক পয়সাও লই না, যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল, তাহাকেই ডাকিয়া দিই। এ সকল কি তুমি জান না ? দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায়, কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রাণী করিয়া, রাজশাসন চালাইতেছি। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম্ম ?

দেবী। রাজা রাণী, যাকে করিবেন, সেই হইতে পারিবে। আমাকে অব্যাহতি দিন্—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।

ভবানী। আর কাহাকেও এ রাজ্য সাজে না। আর কাহারও অতুল ঐশ্বর্য্য নাই—তোমার ধনদানে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার যে ধন আছে, সকলই আমি আপনাকে দিতেছি। আমি ঐ টাকা

যেরূপে খরচ করিতাম, আপনিও সেইরূপ করিবেন। আমি কাশী গিয়া বাস করিব, মানস করিয়াছি।

ভবানী। কেবল তোমার ধনেই কি সকলে তোমার বশ? তুমি রূপে যথার্থ রাজরাণী—গুণে যথার্থ রাজরাণী। অনেকে তোমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া জানে—কেন না, তুমি সন্ন্যাসিনী, মার মত পরের মঙ্গল কামনা কর, অকাতরে ধন দান কর, আবার ভগবতীর মত রূপবতী। তাই আমরা তোমার নামে এ রাজ্য শাসন করি—নহিলে আমাদের কে মানিত?

দেবী। তাই লোকে আমাকে ডাকাইতনী বলিয়া জানে—এ অখ্যাতি মরিলেও যাবে না।

ভবানী। অখ্যাতি কি? এ বরেন্দ্রভূমে আজি কালি কে এমন আছে যে, এ নামে লজ্জিত? কিন্তু সে কথা যাক্—ধর্ম্মাচরণে সুখ্যাতি অখ্যাতি খুঁজিবার দরকার কি? খ্যাতির কামনা করিলেই কর্ম্ম আর নিষ্কাম হইল কৈ? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্মবিসর্জ্জন হইল কৈ?

দেবী। আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না—আপনি মহামহোপাধ্যায়,—আমার স্ত্রীবুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে, তাই বলিতেছি—আমি এ রাণীগিরি হইতে অবসর হইতে চাই। আমার এ আর ভাল লাগে না।

ভবানী। যদি ভাল লাগে না—তবে কালি রঙ্গরাজকে ডাকাইতি করিতে পাঠাইয়াছিলে কেন? কথা যে আমার অবিদিত নাই, তাহা বলা বেশীর ভাগ।

দেবী। কথা যদি অবিদিত নাই, তবে অবশ্য এটাও জানেন যে, কাল রঙ্গরাজ ডাকাইতি করে নাই—ডাকাইতির ভাণ করিয়াছিল মাত্র।

ভবানী। কেন? তা আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দেবী। একটা লোককে ধরিয়া আনিবার জন্য।

ভ। লোকটা কে?

দেবীর মুখে নামটা একটু বাধ বাধ করিল—কিন্তু নাম না করিলেও নয়—ভবানীর সঙ্গে প্রতারণা চলিবে না। অতএব অগত্যা দেবী বলিল, "তার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ভ। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি। তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

দেবী। কিছু দিবার প্রয়োজন ছিল। তার বাপ ইজারাদারের হাতে কয়েদ যায়। কিছু দিয়া ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিয়াছি।

ভ। ভাল কর নাই। হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড। খানখা আপনার বেহাইনের জাতি মারিয়াছিল—তার জাতি যাওয়াই ভাল ছিল।

দেবী শিহরিল। বলিল, "সে কি রকম?"

ভ। তার একটা পুত্রবধূর কেহ ছিল না, কেবল বিধবা মা ছিল। হরবল্লভ সেই গরিবের বাগ্দী অপবাদ দিয়া বউটাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। দুঃখে বউটার মা মরিয়া গেল।

দে। আর বউটা?

ভ। শুনিয়াছি, খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

দেবী। আমাদের সে সব কথায় কাজ কি? আমরা পরহিত-ব্রত নিয়েছি, যার দুঃখ দেখিব, তারই দুঃখ মোচন করিব।

ভ। ক্ষতি নাই। কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি লোক দারিদ্র্যগ্রস্ত—ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বস্ব গিয়াছে। এখন কিছু কিছু পাইলেই, তাহারা আহার করিয়া গায়ে বল পায়। গায়ে বল পাইলেই, তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে। শীঘ্র একদিন দরবার করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কর।

দে। তবে প্রচার করুন যে, এইখানেই আগামী সোমবার দরবার হইবে।

ভ। না। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না। ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে, তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচ শত সিপাহী লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরবার হইবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে, প্রচার করিয়াছি। সোমবার দিন অবধারিত করিয়াছি। সে জঙ্গলে সিপাহী যাইতে সাহস করিবে না—করিলে মারা পড়িবে। ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে লইয়া, আজি বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দে। এবার চলিলাম। কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কি না সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।

এই বলিয়া দেবী উঠিল। আবার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বজরায় গিয়া উঠিল। বজরায় উঠিয়া রঙ্গরাজকে ডাকিয়া চুপি চুপি এই উপদেশ দিল, "আগামী সোমবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে। এই দণ্ডে বজরা খোল—সেইখানেই চল—বর্কন্দাজদিগের সংবাদ দাও, দেবীগড় হইয়া যাও—টাকা লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে অধিক টাকা নাই।"

তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে বজরার মাস্তুলের উপর তিন চারিখানা ছোট বড় সাদা পাল বাতাসে ফুলিতে লাগিল; ছিপখানা বজরার সামনে আসিয়া বজরার সঙ্গে বাঁধা হইল। তাহাতে ষাট

জন জোয়ান বোটে লইয়া বসিয়া, 'মাঈজি-কি জয়' বলিয়া বাহিতে আরম্ভ করিল—সেই জাহাজের মত বজরা তখন তীরবেগে ছুটিল। এদিকে দেখা গেল, বহুসংখ্যক পথিক বা হাটুরিয়া লোকের মত লোক, নদীতীরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া বজরার সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতেছে। তাহাদের হাতে কেবল এক এক লাঠি মাত্র—কিন্তু বজরার ভিতর বিস্তর ঢাল, সড়কি, বন্দুক আছে। ইহারা দেবীর "বর্‌কন্দাজ" সৈন্য।

সব ঠিক দেখিয়া, দেবী স্বহস্তে আপনার শাকান্ন পাকের জন্য হাঁড়িশালায় গেল। হায়! দেবী!—তোমার এ কিরূপ সন্ন্যাস!

একাদশ পরিচ্ছেদ

সোমবারে প্রাতঃসূর্য্যপ্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রাণীর "দরবার" বা "এজ্‌লাস্‌"। সে এজ্‌লাসে কোন মোকদ্দমা মামলা হইত না। রাজকার্য্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিন শত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে—তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজ্‌লাস্‌। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দনকাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ পাতা—তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষার আজ বিশেষ জাঁক। শাড়ী পরা। শাড়ীখানায় ফুলের মাঝে মাঝে এক একখানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত—কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় এত মতির হার যে, বুকের আর বস্ত্র পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী আজ শরৎকালের প্রকৃত দেবীপ্রতিমা মত সাজিয়াছে। এ সব দেবীর রাণীগিরি। দুই পাশে চারি জন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদণ্ড-চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবর্‌দার বড় জাঁকের পোশাক করিয়া, বড় বড় রূপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক, বর্‌কন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচ শত বর্‌কন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সুসজ্জিত—লাল পাগ্‌ড়ি, লাল

আঙ্গরাখা, লাল ধুতি মালকোচা মারা, পায়ে লাল নাগরা, হাতে ঢাল সড়কি। চারি দিকে লাল নিশান পোঁতা।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একবার "দেবী রাণী-কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তার পর দশ জন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতি গান করিল। তার পর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক এক জন করিয়া ভিক্ষার্থী-দিগকে দেবীর সিংহাসনসমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ, সেও প্রণাম করিল—কেন না, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেই জন্য কেহ কখনও তাঁর সন্ধান ইংরেজের নিকট বলিত না, অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকাপোরা ঘড়া সব সাজান ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেবী দরিদ্রগণকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্য্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই। দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।*

কিছু দিন মধ্যে রঙ্গপুরে গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমায়ৎবস্ত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা নাই। ইহাও রটিল যে, অনেক ডাকাইত রাশি রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে—অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহারা দেবীর নিকট দান পাইয়া ঘরে অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির—বলে, টাকা কোথা? ইহার কারণ, ভয় আছে, টাকার কথা শুনিলেই ইজারাদারের পাইক সব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা খরচ পত্র করিতে লাগিল—সুতরাং সকল লোকেরই বিশ্বাস হইল যে, দেবী চৌধুরাণী এবার ভারী রকম লুঠিতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাকালে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রজেশ্বর তাঁর পদবন্দনা করিলেন।

হরবল্লভ অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসল সংবাদ কি? টাকার কি হইয়াছে?"

ব্রজেশ্বর বলিলেন যে, "তাঁহার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই।" হরবল্লভের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—হরবল্লভ চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে টাকা পাও নাই?"

"আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আর এক স্থানে টাকা পাইয়াছি—"

হরবল্লভ। পেয়েছ? তা আমায় এতক্ষণ বল নাই? দুর্গা, বাঁচলেম্!

ব্র। টাকাটা যে স্থানে পাইয়াছি, তাহাতে সে গ্রহণ করা উচিত কি না, বলা যায় না।

হর। কে দিল?

ব্রজেশ্বর অধোবদনে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "তার নামটা মনে আস্‌চে না—সেই যে মেয়ে ডাকাইত একজন আছে?"

হর। কে, দেবী চৌধুরাণী?

ব্র। সেই।

হর। তার কাছে টাকা পাইলে কি প্রকারে?

ব্রজেশ্বরের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে লেখে যে, এখানে বাপের কাছে ভাঁড়াভাঁড়িতে দোষ নাই। ব্রজ বলিল, "ও টাকাটা একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে।"

হর। বদ্ লোকের টাকা! লেখাপড়া কি রকম হইয়াছে?

ব্র। একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া লেখাপড়া করিতে হয় নাই।

বাপ আর এ বিষয়ে বেশী খোঁচাখুঁচি করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, এ অভিপ্রায়ে ব্রজেশ্বর তখনই কথাটা চাপা দিয়া বলিল, "পাপের ধন যে গ্রহণ করে, সেও পাপের ভাগী হয়। তাই ও টাকাটা লওয়া আমার তেমন মত নয়।"

হরবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "টাকা নেব না ত ফাটকে যাব না কি? টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা পুণ্যের টাকা কি? আর জপতপের টাকাই বা কার কাছে পাব? সে আপত্তি ক'রে কাজ নাই। কিন্তু আসল আপত্তি এই যে, ডাকাইতের টাকা, তাতে আবার লেখাপড়া করে নাই—ভয় হয়, পাছে দেরী হ'লে বাড়ী ঘর লুঠপাট করিয়া লইয়া যায়।"

ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

হর। তা টাকার মিয়াদ কত দিন?

ব্র। আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত।

হর। তা সে হোলো ডাকাইত। দেখা দেয় না। কোথা তার দেখা পাওয়া যাবে যে, টাকা পাঠাইয়া দিব?

রা। ঐ দিন সন্ধ্যার পর সে সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে বজরায় থাকিবে। সেইখানে টাকা পৌঁছাইলেই হইবে।

হরবল্লভ বলিলেন, "তা সেই দিন সেইখানেই টাকা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

ব্রজেশ্বর বিদায় হইলেন। হরবল্লভ তখন মনে মনে বুদ্ধি খাটাইয়া কথাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন। শেষে স্থির করিলেন, "হাঁঃ, সে বেটীর আবার টাকা শোধ দিতে যাবে! বেটীকে সিপাহী এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। বৈশাখী সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার পর কাপ্তেন সাহেব পল্টন শুদ্ধ তার বজরায় না উঠে—ত আমার নাম হরবল্লভই নয়। তাকে আর আমার কাছে টাকা নিতে হবে না।"

হরবল্লভ এই পুণ্যময় অভিসন্ধিটা আপনার মনে মনেই রাখিলেন—ব্রজেশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন না।

এদিকে সাগর আসিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে গিয়া গল্প করিল যে, ব্রজেশ্বর একটা রাজরাণীর বজরায় গিয়া, তাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে;—সাগর অনেক মানা করিয়াছিল, তাহা শুনে নাই। মাগী জেতে কৈবর্ত্ত—আর তার দুইটা বিবাহ আছে—সুতরাং ব্রজেশ্বরের জাতি গিয়াছে, সুতরাং সাগর আর ব্রজেশ্বরের পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিবে না, ইহা স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ব্রহ্মঠাকুরাণী এ সকল কথা ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করায় ব্রজেশ্বর অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, "রাণীজি জাত্যংশে ভাল—আমার পিতৃঠাকুরের পিসী হয়। আর বিয়ে,—তা আমারও তিনটা, তারও তিনটা।"*

ব্রহ্মঠাকুরাণী বুঝিল, কথাটা মিথ্যা; কিন্তু সাগরের মতলব যে, ব্রহ্মঠাকুরাণী এ গল্পটা নয়নতারার কাছে করে। সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না। নয়নতারা একে সাগরকে দেখিয়া জ্বলিয়াছিল, আবার শুনিল যে, স্বামী একটা বুড়া কন্যে বিবাহ করিয়াছে। নয়নতারা একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং কিছু দিন ব্রজেশ্বর নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারিলেন না—সাগরের ইজারা-মহল হইয়া রহিলেন।

সাগরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। কিন্তু নয়নতারা বড় গোল বাধাইল—শেষে গিন্নীর কাছে গিয়া নালিস করিল। গিন্নী বলিলেন, "তুমি বাছা, পাগল মেয়ে। বামনের ছেলে কি কৈবর্ত্ত বিয়ে করে গা? তোমাকে সবাই ক্ষেপায়, তুমিও ক্ষেপ।"

নয়ান বৌ তবু বুঝিল না। বলিল, "যদি সত্য সত্যই বিয়ে হয়ে থাকে?" গিন্নী বলিলেন, "যদি সত্যই হয়, তবে বৌ বরণ করে ঘরে তুলব। বেটার বৌ ত আর ফেল্‌তে পারব না।"

এই সময়ে ব্রজেশ্বর আসিল, নয়ান বৌ অবশ্য পলাইয়া গেল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি বল্‌ছিলে গা ?"

গিন্নী বলিলেন, "এই বল্‌ছিলাম যে, তুই যদি আবার বিয়ে করিস্, তবে আবার বৌ বরণ করে ঘরে তুলি।"

ব্রজেশ্বর অন্তমনা হইল, কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

প্রদোষকালে গিন্নী ঠাকুরাণী কর্ত্তা মহাশয়কে বাতাস করিতে করিতে, ভর্ত্তৃচরণে এই কথা নিবেদন করিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনটা কি ?"

গিন্নী। আমি ভাবি কি যে, সাগর বৌ ঘর করে না। নয়ান বৌ ছেলের যোগ্য বৌ নয়। তা যদি একটি ভাল দেখে ব্রজ বিয়ে ক'রে সংসার ধর্ম্ম করে, আমার সুখ হয়।

কর্ত্তা। তা ছেলের যদি সে রকম বোঝ, তা আমায় বলিও। আমি ঘটক ডেকে ভাল দেখে সম্বন্ধ করব।

গিন্নী। আচ্ছা, আমি মন বুঝিয়া দেখিব।

মন বুঝিবার ভার ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপর পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরাণী অনেক বিরহসন্তপ্ত এবং বিবাহ-প্রয়াসী রাজপুত্রের উপকথা ব্রজকে শুনাইলেন, কিন্তু ব্রজের মন তাহাতে কিছু বোঝা গেল না। তখন ব্রহ্মঠাকুরাণী স্পষ্ট জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। কিছুই খবর পাইলেন না। ব্রজেশ্বর কেবল বলিল, "বাপ মা যে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাই পালন করিব।"

কথাটার আর বড় উচ্চবাচ্য হইল না।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসিল, কিন্তু দেবী রাণীর ঋণ পরিশোধের কোন উদ্যোগ হইল না। হরবল্লভ এক্ষণে অঋণী, মনে করিলে অনায়াসে অর্থসংগ্রহ করিয়া দেবীর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন, কিন্তু সেদিকে মন দিলেন না। তাঁহাকে এ বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ব্রজেশ্বর দুই চারি বার এ কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু হরবল্লভ তাঁহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। এদিকে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রায়াগতা—দুই চারি দিন আছে মাত্র। তখন ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরবল্লভ বলিলেন, "ভাল, ব্যস্ত হইও না। আমি টাকার সন্ধানে চলিলাম। ষষ্ঠীর দিন ফিরিব।" হরবল্লভ শিবিকা-রোহণে পাচক ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও দুই জন লাঠিয়াল (পাইক) সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

হরবল্লভ টাকার চেষ্টায় গেলেন বটে, কিন্তু সে আর এক রকম। তিনি বরাবর রঙ্গপুর গিয়া কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন কালেক্টরই শান্তিরক্ষক ছিলেন। হরবল্লভ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে সিপাহী দিউন, আমি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিব। ধরাইয়া দিতে পারিলে আমাকে কি পুরস্কার দিবেন বলুন।"

শুনিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, দেবী চৌধুরাণী দস্যুদিগের নেত্রী। তাহাকে ধরিতে পারিলে আর আর সকলে ধরা পড়িবে। তিনি দেবীকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন মতে সফল হইতে পারেন নাই। অতএব হরবল্লভ সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে ধরাইয়া দিবে শুনিয়া, সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। হরবল্লভ বলিলেন, "আমার সঙ্গে পাঁচ শত সিপাহী পাঠাইতে হুকুম হউক।" সাহেব সিপাহীর হুকুম দিলেন। হরবল্লভকে সঙ্গে করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্রেনান্ সিপাহী লইয়া দেবীকে ধরিতে চলিলেন।

হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের নিকট সবিশেষ শুনিয়াছিলেন, ঠিক সে ঘাটে দেবীকে পাওয়া যাইবে। সম্ভবতঃ দেবী বজরাতেই থাকিবে। লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্রেনান্ সেই জন্য কতক ফৌজ লইয়া ছিপে চলিলেন। এইরূপ পাঁচখানি ছিপ ভাঁটি দিয়া দেবীর বজরা ঘেরাও করিতে চলিল। এদিকে লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাহেব আর কতক সিপাহী সৈন্য লুক্কায়িত ভাবে, বন দিয়া

বন দিয়া তটপথে পাঠাইলেন। যেখানে দেবীর বজরা থাকিবে, হরবল্লভ বলিয়া দিল; সেইখানে তীরবর্ত্তী বনমধ্যে ফৌজ তিনি লুকাইয়া রাখিলেন, যদি দেবী ছিপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তটপথে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে এই ফৌজের দ্বারা ঘেরাও করিয়া ধরিবেন। আরও এক পলাইবার পথ ছিল—ছিপগুলি ভাঁটি দিয়া আসিবে, দূর হইতে ছিপ দেখিতে পাইলে দেবী ভাঁটি দিয়া পলাইতে পারে, অতএব লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ব্রেনান্‌ অবশিষ্ট সিপাহীগুলিকে দুই ক্রোশ ভাঁটিতে পাঠাইলেন, তাহাদিগের থাকিবার জন্য এমন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন যে, সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকার সময়ে সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সিপাহীরা সেখানে তীরে লুকাইয়া থাকিবে, বজরা দেখিলেই জলে আসিয়া তাহা ঘেরাও করিবে।

সন্ন্যাসিনী রমণীকে ধরিবার জন্য এইরূপ ঘোরতর আড়ম্বর হইল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা এ আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন মনে করেন নাই। দেবী সন্ন্যাসিনী হউক আর নাই হউক, তাহার আজ্ঞাধীন হাজার যোদ্ধা আছে, সাহেবেরা জানিতেন। এই যোদ্ধাদিগের নাম "বর্‌কন্দাজ"। অনেক সময়ে কোম্পানীর সিপাহীদিগকে এই বর্‌কন্দাজদিগের লাঠির চোটে পলাইতে হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ। হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালায় আব্রু পর্দ্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই সর্দ্দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে! পীনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে —সমাজ-শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি, লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র! ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর; কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই। শুনিতে পাই, সেকালে তুমি না কি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের

মুখে শুনিতে পাই, "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং।" এখন মূর্খের ঔষধ "বাপু" "বাছা"—তাহাতেও রোগ ভাল হয় না। তোমার সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনেকেরই গুণ এই দুনিয়াতে জাজ্বল্যমান। ইস্তক আড়া বাঁকারি খুঁটি খোঁটা লাগায়েৎ শ্রীনন্দনন্দনের মোহন বংশী, সকলেরই গুণ বুঝি—কিন্তু লাঠি! তোমার মত কেহ না। তুমি আর নাই—গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে; তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া নন্দনকাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত-বৃক্ষশাখার ঠেক্‌নো হইয়া আছ, দেবকন্যারা তোমার ঘায় কল্পবৃক্ষ হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ ফল সকল পাড়িয়া লইতেছে। এক আধটা ফল যেন পৃথিবীতে গড়াইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার লাঠির ভয়ে এত সিপাহীর সমাগম, তার কাছে একখানি লাঠিও ছিল না। নিকটে একটি লাঠিয়ালও ছিল না। দেবী সেই ঘাটে—যে ঘাটে বজরা বাঁধিয়া ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সেই ঘাটে। সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। সেই বজরা তেমনই সাজান—সব ঠিক্ সে রকম নয়। সে ছিপখানি সেখানে নাই—তাহাতে যে পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল ছিল, তাহারা নাই। তার পর বজরার উপরেও একটি পুরুষমানুষ নাই—মাঝি মাল্লা, রঙ্গরাজ প্রভৃতি কেহ নাই। কিন্তু বজরার মাস্তুল উঠান—চারিখানা পাল তোলা আছে—বাতাসের অভাবে পাল মাস্তুলে জড়ান পড়িয়া আছে। বজরার নোঙ্গরও ফেলা নহে, কেবল দুগাছা কাছিতে তীরে খোঁটায় বাঁধা আছে।

তৃতীয়, দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণভূষিতা মহার্ঘবস্ত্রপরিহিতা নয়, কিন্তু আর এক প্রকারে শোভা আছে। ললাট, গণ্ড, বাহু, হৃদয়, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত; চন্দন-চর্চ্চিত ললাট বেষ্টন করিয়া সুগন্ধি পুষ্পের মালা শিরোদেশের বিশেষ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। হাতে ফুলের বালা। অন্য অলঙ্কার একখানিও নাই। পরণে সেই মোটা শাড়ী।

আর, আজ দেবী একা ছাদের উপর বসিয়া নহে, কাছে আর দুই জন স্ত্রীলোক বসিয়া। একজন নিশি, অপর দিবা। এই তিন জনে যে কথাটা হইতেছিল, তাহার মাঝখান হইতে বলিলেও ক্ষতি নাই।

দিবা বলিতেছিল—দিবা অশিক্ষিতা, ইহা পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত—বলিতেছিল, "হাঁঃ, পরমেশ্বরকে না কি আবার প্রত্যক্ষ দেখা যায়?"

প্রফুল্ল বলিল, "না, প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখার কথা

বলিতেছিলাম না—আমি প্রত্যক্ষ করার কথা বলিতেছিলাম। প্রত্যক্ষ ছয় রকম। তুমি যে প্রত্যক্ষ দেখার কথা কহিতেছিলে, সে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ—চক্ষের প্রত্যক্ষ। আমার গলার আওয়াজ তুমি শুনিতে পাইতেছ—আমার গলার আওয়াজ তোমার শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ কানের প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেছে। আমার হাতের ফুলের গন্ধ তোমার নাকে যাইতেছে কি ?”

দিবা। যাইতেছে।

দেবী। ওটা তোমার ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইতেছে। আর আমি যদি তোমার গালে এক চড় মারি, তাহা হইলে তুমি আমার হাতকে প্রত্যক্ষ করিবে—সেটা ত্বাচ প্রত্যক্ষ। আর এখনি নিশি যদি তোমার মাথা খায়, তাহা হইলে, তোমার মগজটা তার রাসন প্রত্যক্ষ হইবে।

দিবা। মন্দ প্রত্যক্ষ হইবে না। কিন্তু পরমেশ্বরকে দেখাও যায় না, শোনাও যায় না, শোঁকাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না, খাওয়াও যায় না। তাঁকে প্রত্যক্ষ করিব কি প্রকারে ?

নিশি। এ ত গেল পাঁচ রকম প্রত্যক্ষ। ছয় রকম প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছি ; কেন না, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ ছাড়া আর একটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, জান না ?

দিবা। কি, দাঁত ?

নিশি। দূর্ হ পোড়ারমুখী ! ইচ্ছা করে, কিল মেরে তোর সে ইন্দ্রিয়ের পাটিকে পাটি ভেঙ্গে দিই।

দেবী। (হাসিতে হাসিতে) চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয়াধিপতি মনঃ উভয়েন্দ্রিয় অর্থাৎ মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া মনের দ্বারাও প্রত্যক্ষ আছে। ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।

নিশি। “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—প্রমাণাভাবাৎ।”

যিনি সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ও ভাষ্য পড়িয়াছেন, তিনি নিশির এই ব্যঙ্গোক্তির মর্ম্ম বুঝিবেন। নিশি প্রফুল্লের এক প্রকার সহাধ্যায়িনী ছিল।

প্রফুল্ল উত্তর করিল, “সূত্রকারস্তোভয়েন্দ্রিয়শূন্যত্বাৎ—ন তু প্রমাণাভাবাৎ।”

দিবা। রেখে দাও তোমার হাবাৎ মাবাৎ—আমি ত পরমেশ্বরকে কখন মনের ভিতর দেখিতে পাই নাই।

প্রফুল্ল। আবার দেখা ? চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই দেখা—অন্য কোন প্রত্যক্ষ দেখা নয়,—মানস প্রত্যক্ষও দেখা নয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়—রূপ, বহির্ব্বিষয় ; মানস প্রত্যক্ষের বিষয়—অন্তর্ব্বিষয়। মনের দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইতে পারেন। ঈশ্বরকে দেখা যায় না।

দিবা। কই? আমি ত ঈশ্বরকে কখনও মনের ভিতর কোন রকম প্রত্যক্ষ করি নাই?

প্রফুল্ল। মানুষের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষশক্তি অল্প—সাহায্য বা অবলম্বন ব্যতীত সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

দিবা। প্রত্যক্ষের জন্য আবার সাহায্য কি রকম? দেখ, এই নদী, জল, গাছ, পালা, নক্ষত্র, সকলই আমি বিনা সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি।

"সকলই নয়। ইহার একটি উদাহরণ দিব?" বলিয়া প্রফুল্ল হাসিল।

হাসির রকমটা দেখিয়া নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, "ইংরেজের সিপাহী আমাকে আজ ধরিতে আসিতেছে জান?"

দিবা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা ত জানি।"

প্রফুল্ল। সিপাহী প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

দিবা। না। কিন্তু আসিলে প্রত্যক্ষ করিব।

প্র। আমি বলিতেছি, আসিয়াছে, কিন্তু বিনা সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছ না। এই সাহায্য গ্রহণ কর।

এই বলিয়া প্রফুল্ল দিবার হাতে দূরবীক্ষণ দিল। ঠিক্ যে দিকে দেখিতে হইবে, দেখাইয়া দিল। দিবা দেখিল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলে?"

দিবা। একখানা ছিপ। উহাতে অনেক মানুষ দেখিতেছি বটে।

দেবী। উহাতে সিপাহী আছে। আর একখানা দেখ।

এরূপে দেবী দিবাকে পাঁচখানা ছিপ নানা স্থানে দেখাইল। নিশিও দেখিল। নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "ছিপগুলি চরে লাগাইয়া আছে, দেখিতেছি। আমাদের ধরিতে আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের কাছে না আসিয়া ছিপ তীরে লাগাইয়া আছে কেন?"

দেবী। বোধ হয়, ডাঙ্গা-পথে যে সকল সিপাহী আসিবে, তাহারা আসিয়া পৌঁছে নাই। ছিপের সিপাহী তাহাদের অপেক্ষায় আছে। ডাঙ্গার সিপাহী আসিবার আগে, ছিপের সিপাহী আগু হইলে, আমি ডাঙ্গা-পথে পলাইতে পারি, এই শঙ্কায় উহারা আগু হইতেছে না।

দিবা। কিন্তু আমরা ত উহাদের দেখিতে পাইতেছি; মনে করিলেই ত পলাইতে পারি।

দেবী। ওরা তা জানে না। ওরা জানে না যে, আমরা দূরবীণ রাখি।

নিশি। ভগিনি! প্রাণে বাঁচিলে এক দিন না এক দিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক। আজ ডাঙ্গায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিবে চল। এখনও যদি ডাঙ্গায় সিপাহী আসে নাই, তবে ডাঙ্গা-পথে এখন প্রাণরক্ষার উপায় আছে।

দেবী। যদি প্রাণের জন্য আমি এত কাতর হইব, তবে আমি সকল সংবাদ জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলাম কেন? আসিলাম যদি, তবে লোক জন সবাইকে বিদায় দিলাম কেন? আমার হাজার বরকন্দাজ আছে—তাহাদের সকলকে অন্য স্থানে পাঠাইলাম কেন?

দিবা। আমরা আগে যদি জানিতাম, তাহা হইলে তোমায় এমন কর্ম্ম করিতে দিতাম না।

দেবী। তোমার সাধ্য কি, দিবা! যা আমি স্থির করিয়াছি, তা অবশ্য করিব। আজ স্বামিদর্শন করিব, স্বামীর অনুমতি লইয়া জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিব। তোমরা আমার কথা শুনিও, দিবা নিশি! আমার স্বামী যখন ফিরিয়া যাইবেন, তখন তাঁহার নৌকায় উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইও। আমি একা ধরা দিব, আমি একা ফাঁসি যাব। সেই জন্যই বজরা হইতে আর সকলকে বিদায় দিয়াছি। তোমরা তখন গেলে না। কিন্তু আমায় এই ভিক্ষা দাও—আমার স্বামীর নৌকায় উঠিয়া পলায়ন করিও।

নিশি। ধড়ে প্রাণ থাকিতে তোমায় ছাড়িব না। মরিতে হয়, একত্র মরিব।

প্র। ও সকল কথা এখন থাক্—যাহা বলিতেছিলাম, তা বলিয়া শেষ করি। যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিলে না, তা যেমন দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিলে, তেমন ঈশ্বরকে মানস প্রত্যক্ষ করিতে দূরবীণ চাই।

দিবা। মনের আবার দূরবীণ কি?

প্র। যোগ।

দিবা। কি—সেই ন্যাস, প্রাণায়াম, কুম্ভক, বুজরুকী, ভেল্কী—

প্র। তাকে আমি যোগ বলি না। যোগ অভ্যাস মাত্র। কিন্তু সকল অভ্যাসই যোগ নয়। তুমি যদি দুধ ঘি খাইতে অভ্যাস কর, তাকে যোগ বলিব না। তিনটি অভ্যাসকেই যোগ বলি।

দিবা। কি কি তিনটি?

প্র। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ।

ততক্ষণ নিশি দূরবীণ লইয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বলিল, "সম্প্রতি উপস্থিত গোলযোগ।"

প্র। সে আবার কি? আবার গোলযোগ কি?

নিশি। একখানা পাল্কী আসিতেছে। বুঝি ইংরাজের চর।

প্রফুল্ল নিশির হাত হইতে দূরবীণ লইয়া পাল্কী দেখিল। বলিল, "এই আমার সুযোগ। তিনিই আসিতেছেন। তোমরা নীচে যাও।"

দিবা ও নিশি ছাদ হইতে নামিয়া কামরার ভিতর গেল। পাল্কী ক্রমে বাহিয়া আসিয়া বজরার গায়ে লাগিল। সেই পাল্কীতে—ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর, লাফাইয়া বজরায় উঠিয়া, পাল্কী তফাতে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। পাল্কীওয়ালা তাহাই করিল।

ব্রজেশ্বর নিকটে আসিলে, প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনত মস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে উভয়ে বসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "আজ টাকা আনিতে পারি নাই, দুই চারি দিনে দিতে পারিব বোধ হয়। দুই চারি দিনের পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, সেটা জানা চাই।"

ও ছি! ছি! ব্রজেশ্বর! দশ বছরের পর প্রফুল্লের সঙ্গে এই কি কথা!

দেবী উত্তর করিল, "আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না—" বলিতে বলিতে দেবীর গলাটা বুজিয়া আসিল—দেবী একবার চোখ মুছিল—"আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু আমার ঋণ শুধিবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হইবে, ঐ টাকা গরীব দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন—তাহা হইলে আমি পাইব।"

ব্রজেশ্বর দেবীর হাত ধরিল। বলিল, "প্রফুল্ল! তোমার টাকা—"

ছাই টাকা! কথা শেষ হইল না—মুখের কথা মুখে রহিল। যেমন ব্রজেশ্বর "প্রফুল্ল" বলিয়া ডাকিয়া হাত ধরিয়াছে, অমনি প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া, চোখের জলের স্রোত ছুটিল। ব্রজেশ্বরের ছাই টাকার কথা সে স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল। তেজস্বিনী দেবী রাণী ছেলেমানুষের মত বড় কান্নাটা কাঁদিল। ব্রজেশ্বর ততক্ষণ বড় বিপন্ন হইলেন। তাঁর মনে মনে বোধ আছে যে, এ পাপীয়সী ডাকাইতি করিয়া খায়, এর জন্য এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলা হবে না। কিন্তু চোখের জল, অত বিধি ব্যবস্থা অবগত নয়, তারা অনাহূত আসায় ব্রজেশ্বরের চোখ ভরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর মনে করিলেন, হাত উঠাইয়া চোখ মুছিলেই ধরা পড়িব। কাজেই চোখ মোছা হইল না। চোখ যখন মোছা হইল না, তখন পুকুর ছাপাইল—গাল বাহিয়া ধারা চলিল—প্রফুল্লের হাতে পড়িল।

তখন বালির বাঁধটা ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রজেশ্বর মনে করিয়া আসিয়াছিলেন যে, প্রফুল্লকে ডাকাইতি করার জন্য ভারী রকম তিরস্কার করিবেন, পাপীয়সী বলিবেন—আরও দুই চারিটা

লম্বা চৌড়া কথা বলিয়া আবার একবার জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু কেঁদে যার হাত ভিজিয়ে দিলেন, তার উপর কি আর লম্বা চৌড়া কথা হয় ?

তখন চক্ষু মুছিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "দেখ প্রফুল্ল, তোমার টাকা আমার টাকা—তার পরিশোধের জন্য আমি কেন কাতর হব ? কিন্তু আমি বড় কাতরই হইয়াছি। আমি আজ দশ বৎসর কেবল তোমাকেই ভাবিয়াছি। আমার আর দুই স্ত্রী আছে—আমি তাহাদিগকে এ দশ বৎসর স্ত্রী মনে করি নাই; তোমাকেই স্ত্রী জানি। কেন, তা বুঝি তোমায় আমি বুঝাইতে পারিব না। শুনিয়াছিলাম, তুমি নাই। কিন্তু আমার পক্ষে তুমি ছিলে। আমি তার পরও মনে জানিতাম, তুমিই আমার স্ত্রী—মনে আর কাহারও স্থান ছিল না। বলব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বলাতেও ক্ষতি নাই—তুমি মরিয়াছ শুনিয়া, আমিও মরিতে বসিয়াছিলাম। এখন মনে হয়, মরিলেই ভাল হইত; তুমি মরিলে ভাল হইত—না মরিয়াছিলে ত আমি মরিলেই ভাল হইত। এখন যাহা শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি, তা শুনিতে হইত না, বুঝিতে হইত না। আজ দশ বৎসরের হারান ধন তোমায় পাইয়াছি, আমার স্বর্গসুখের অপেক্ষা অধিক সুখ হইত। তা না হয়ে প্রফুল্ল, আজ তোমায় পাইয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা।" তার পর একবার থামিয়া একটু ঢোক গিলিয়া, মাথা টিপিয়া ধরিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "মনের মন্দিরের ভিতর সোনার প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছিলাম—আমার সেই প্রফুল্ল—মুখে আসে না—সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি !"

প্রফুল্ল বলিল, "কি ? ডাকাইতি করি ?"

ব্র। কর না কি ?

ইহার উত্তরে প্রফুল্ল একটা কথা বলিতে পারিত। যখন ব্রজেশ্বরের পিতা প্রফুল্লকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তখন প্রফুল্ল কাতর হইয়া, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি অন্নের কাঙ্গাল, তোমরা তাড়াইয়া দিলে—আমি কি করিয়া খাইব ?" তাহাতে শ্বশুর উত্তর দিয়াছিলেন, "চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইও।" প্রফুল্ল মেধাবিনী—সে কথা ভুলে নাই। ভুলিবার কথাও নহে। আজ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ডাকাইত বলিয়া, এই ভর্ৎসনা করিল; আজ প্রফুল্লের সেই উত্তর ছিল। প্রফুল্লের এই উত্তর ছিল, "আমি ডাকাইত বটে—তা এখন এত ভর্ৎসনা কেন ? তোমরাই ত চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইতে বলিয়াছিলে। আমি গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিতেছি।" এ উত্তর সম্বরণ করাই যথার্থ পুণ্য। প্রফুল্ল সে পুণ্য সঞ্চয় করিল,—সে কথা মুখেও আনিল না। প্রফুল্ল স্বামীর কাছে হাত যোড় করিয়া এই উত্তর দিল। বলিল, "আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে

প্র। সত্য বলিতেছ ?

ব্র। তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব।

প্র। আমার শ্বশুর কি বলিবেন ?

ব্র। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করিব।

প্র। হায়! এ কথা কাল শুনি নাই কেন ?

ব্র। কাল শুনিলে কি হইত ?

প্র। তাহা হইলে কার সাধ্য আজ আমায় ধরে ?

ব্র। এখন ?

প্র। এখন আর উপায় নাই। তোমার পাল্সী ডাক—নিশি ও দিবাকে লইয়া শীঘ্র যাও।

ব্রজেশ্বর আপনার পাল্সী ডাকিল। পাল্সীওয়ালা নিকটে আসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "তোরা শীঘ্র পলা, ঐ কোম্পানির সিপাহীর ছিপ আসিতেছে; তোদের দেখিলে উহারা বেগার ধরিবে। শীঘ্র পলা, আমি যাইব না, এইখানে থাকিব।"

পাল্সীর মাঝি মহাশয়, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ পাল্সী খুলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বর চেনা লোক, টাকার ভাবনা নাই।

পাল্সী চলিয়া গেল দেখিয়া, প্রফুল্ল বলিল, "তুমি গেলে না ?"

ব্র। কেন, তুমি মরিতে জান, আমি জানি না ? তুমি আমার স্ত্রী—আমি তোমায় শত বার ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার স্বামী—বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি রক্ষা করিতে পারিব না—তাই বলিয়া কি বিপদ্‌কালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব ?

"তবে কাজেই আমি স্বীকার করিলাম, প্রাণরক্ষার যদি কোন উপায় হয়, তা আমি করিব।" এই বলিতে বলিতে প্রফুল্ল আকাশপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে যেন কিছু ভরসা হইল। আবার তখনই নির্ভরসা হইয়া বলিল, "কিন্তু আমার প্রাণ-রক্ষায় আর এক অমঙ্গল আছে।"

ব্র। কি ?

প্র। এ কথা তোমায় বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর না বলিলে নয়। এই সিপাহীদের সঙ্গে আমার শ্বশুর আছেন। আমি ধরা না পড়িলে তাঁর বিপদ্‌ ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

ব্রজেশ্বর শিহরিল—মাথায় করাঘাত করিল। বলিল, "তিনিই কি গোইন্দা?"

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বরের বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। এখানে আজিকার রাত্রে যে দেবী চৌধুরাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, এ কথা হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর আর কাহারও কাছে এ কথা বলেন নাই; দেবীরও যে গূঢ় মন্ত্রণা, আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ দেবী এ ঘাটে আসিবার আগেই কোম্পানির সিপাহী রঙ্গপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; নহিলে ইহারই মধ্যে পৌঁছিত না। আর ইতিপূর্ব্বেই হরবল্লভ কোথায় যাইতেছেন, কাহারও কাছে প্রকাশ না করিয়া দূরযাত্রা করিয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। কথাটা বুঝিতে দেরি হইল না। তাই হরবল্লভ টাকা পরিশোধের কোন উদ্যোগ করেন নাই। তথাপি ব্রজেশ্বর ভুলিলেন না যে,

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিলেন, "আমি মরি কোন ক্ষতি নাই। তুমি মরিলে, আমার মরার অধিক হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

প্র। সেজন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না, অতএব তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি তোমায় রক্ষা করিলে করিতে পারিবেন। তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে, আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিব না। তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।

এই কথা দেবী আন্তরিক বলিয়াছিল। হরবল্লভ প্রফুল্লের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, হরবল্লভ এখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত। তবু দেবী তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম। যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।

কিন্তু এ সময়ে তীরবর্ত্তী অরণ্যমধ্য হইতে গভীর তূর্য্যধ্বনি হইল। দুই জনেই চমকিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবী ডাকিল, "নিশি!"

নিশি ছাদের উপর আসিল।

দেবী। কার ভেরী ঐ ?

নিশি। যেন দাড়ি বাবাজীর বলিয়া বোধ হয়।

দেবী। রঙ্গরাজের ?

নিশি। সেই রকম।

দেবী। সে কি ? আমি রঙ্গরাজকে প্রাতে দেবীগড় পাঠাইয়াছি।

নিশি। বোধ হয়, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দেবী। রঙ্গরাজকে ডাক।

ব্রজেশ্বর বলিল, "ভেরীর আওয়াজ অনেক দূর হইতে হইয়াছে। এখান হইতে ডাকিলে ডাক শুনিতে পাইবে না। আমি নামিয়া গিয়া ভেরীওয়ালাকে খুঁজিয়া আনিতেছি।"

দেবী বলিল, "কিছু করিতে হইবে না। তুমি একটু নীচে গিয়া নিশির কৌশল দেখ।"

নিশি ও ব্রজ নীচে আসিল। নিশি নীচে গিয়া, এক বাঁশী বাহির করিল। নিশি গীত বাদ্যে বড় পটু, সে শিক্ষাটা রাজবাড়ীতে হইয়াছিল। নিশিই দেবীর বীণার ওস্তাদ। নিশি বাঁশীতে ফুঁ দিয়া মল্লারে তান মারিল। অনতিবিলম্বে রঙ্গরাজ বজরায় আসিয়া উঠিয়া, দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিল।

এই সময়ে ব্রজেশ্বর নিশিকে বলিল, "তুমি ছাদে যাও। তোমার কাছে কেহ বোধ হয়, কথা লুকাইবে না। কি কথা হয়, শুনিয়া আসিয়া আমাকে সব বলিও।"

নিশি স্বীকৃত হইয়া, কামরার বাহির হইল—বাহির হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "আপনি একটু বাহিরে আসিয়া দেখুন।"

ব্রজেশ্বর মুখ বাড়াইয়া দেখিল। দেখিতে পাইল, জঙ্গলের ভিতর হইতে অগণিত মনুষ্য বাহির হইতেছে। নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "উহারা কারা ? সিপাই ?"

নিশি বলিল, "বোধ হয় উহারা বরকন্দাজ। রঙ্গরাজ আনিয়া থাকিবে।"

দেবীও সেই মনুষ্যশ্রেণী দেখিতেছিল, এমন সময়ে রঙ্গরাজ আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেন, রঙ্গরাজ ?"

রঙ্গরাজ প্রথমে কোন উত্তর করিল না। দেবী পুনরপি বলিল, "আমি সকালে তোমাকে দেবীগড় পাঠাইয়াছিলাম। সেখানে যাও নাই কেন ? আমার কথা অমান্য করিয়াছ কেন ?"

রঙ্গ। আমি দেবীগড় যাইতেছিলাম—পথে ঠাকুরজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

দেবী। ভবানী ঠাকুর ?

রঙ্গ। তাঁর কাছে শুনিলাম, কোম্পানির সিপাহী আপনাকে ধরিতে আসিতেছে।

তাই আমরা দুই জনে বর্‌কন্দাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছি। বর্‌কন্দাজ জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া আমি তীরে বসিয়াছিলাম। ছিপ আসিতেছে দেখিয়া, আমি ভেরী বাজাইয়া সঙ্কেত করিয়াছি।

দেবী। ও জঙ্গলেও সিপাহী আছে?

রঙ্গ। তাহাদের আমরা ঘেরিয়া ফেলিয়াছি।

দেবী। ঠাকুরজি কোথায়?

রঙ্গ। ঐ বর্‌কন্দাজ লইয়া বাহির হইতেছেন।

দেবী। তোমরা কত বর্‌কন্দাজ আনিয়াছ?

রঙ্গ। প্রায় হাজার হইবে।

দেবী। সিপাহী কত?

রঙ্গ। শুনিয়াছি পাঁচ শ।

দেবী। এই পনের শ লোকের লড়াই হইলে, মরিবে কত?

রঙ্গ। তা দুই চারি শ মরিলেও মরিতে পারে।

দেবী। ঠাকুরজিকে গিয়া বল—তুমিও শোন যে, তোমাদের এই আচরণে আমি আজ মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া পাইলাম।

রঙ্গ। কেন, মা?

দেবী। একটা মেয়েমানুষের প্রাণের জন্য এত লোক তোমরা মারিবার বাসনা করিয়াছ—তোমাদের কি কিছু ধর্ম্মজ্ঞান নাই? আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, আমি একা মরিব—আমার জন্য চারি শ লোক কেন মরিবে? আমায় কি তোমরা এমন অপদার্থ ভাবিয়াছ যে, আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব?

রঙ্গ। আপনি বাঁচিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইবে।

দেবী রাগে, ঘৃণায়, অধীর হইয়া বলিল, "ছি!" সেই ধিক্কারে রঙ্গরাজ অধোবদন হইল—মনে করিল, "পৃথিবী দ্বিধা হউক, আমি প্রবেশ করি।"

দেবী তখন বিস্ফারিত নয়নে, ঘৃণাস্ফুরিত কম্পিতাধরে বলিতে লাগিল, "শোন, রঙ্গরাজ! ঠাকুরজিকে গিয়া বল, এই মুহূর্ত্তে বর্‌কন্দাজ সকল ফিরাইয়া লইয়া যাউন। তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইলে, আমি এই জলে ঝাঁপ দিয়া মরিব, তোমরা কেহ রাখিতে পারিবে না।"

রঙ্গরাজ এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, "আমি চলিলাম। ঠাকুরজিকে এই সকল কথা জানাইব। তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহা করিবেন। আমি উভয়েরই আজ্ঞাকারী।"

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। নিশি ছাদে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছিল। রঙ্গরাজ গেলে, সে দেবীকে বলিল, "ভাল, তোমার প্রাণ লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কাহারও নিষেধ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী—তাঁর জন্যেও ভাবিলে না?"

দেবী। ভাবিয়াছি ভগিনি! ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। জগদীশ্বর মাত্র ভরসা। যা হইবার, হইবে। কিন্তু যাই হউক নিশি—এক কথা সার। আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?

নিশি মনে মনে দেবীকে ধন্য ধন্য বলিল। ভাবিল, "এই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়াছিল। ইহার সঙ্গে মরিয়াও সুখ।"

নিশি গিয়া, সকল কথা ব্রজেশ্বরকে শুনাইল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে আর আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারিল না; মনে মনে বলিল, "যথার্থ দেবীই বটে। আমি নরাধম! আমি আবার ইহাকে ডাকাইত বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে গিয়াছিলাম।"

এদিকে পাঁচ দিক্ হইতে পাঁচখানা ছিপ আসিয়া বজরার অতি নিকটবর্ত্তী হইল। প্রফুল্ল সেদিকে দৃক্‌পাতও করিল না, প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ শরীরে ছাদের উপরে বসিয়া রহিল। প্রফুল্ল ছিপ দেখিতেছিল না—বরকন্দাজ দেখিতেছিল না। দূর আকাশপ্রান্তে তাহার দৃষ্টি। আকাশপ্রান্তে একখানা ছোট মেঘ, অনেকক্ষণ হইতে দেখা দিয়াছিল। প্রফুল্ল তাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন সেখানা একটু বাড়িল; তখন "জয় জগদীশ্বর!" বলিয়া প্রফুল্ল ছাদ হইতে নামিল।

প্রফুল্লকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া, নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার স্বামীকে বাঁচাইব।"

নিশি। আর তুমি?

দেবী। আমার কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। আমি যাহা বলি, যাহা করি, এখন তাহাতে বড় সাবধানে মনোযোগ দাও। তোমার আমার অদৃষ্টে যাই হৌক, আমার স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে, দিবাকে বাঁচাইতে হইবে, শ্বশুরকে বাঁচাইতে হইবে।

এই বলিয়া দেবী একটা শাঁক লইয়া ফুঁ দিল। নিশি বলিল, "তবু ভাল।"

দেবী বলিল, "ভাল কি মন্দ, বিবেচনা করিয়া দেখ। যাহা যাহা করিতে হইবে, তোমাকে বলিয়া দিতেছি। তোমার উপর সব নির্ভর।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিপীলিকাশ্রেণীবৎ বরকন্দাজের দল ত্রিস্রোতার তীর-বন সকল হইতে বাহির হইতে লাগিল। মাথায় লাল পাগড়ী, মালকোঁচামারা, খালি পা—জলে লড়াই করিতে হইবে বলিয়া কেহ জুতা আনে নাই। সবার হাতে ঢাল সড়কি—কাহারও কাহারও বন্দুক আছে—কিন্তু বন্দুকের ভাগ অল্প। সকলেরই পিঠে লাঠি বাঁধা—এই বাঙ্গালার জাতীয় হাতিয়ার। বাঙ্গালী ইহার প্রকৃত ব্যবহার জানিত; লাঠি ছাড়িয়াই বাঙ্গালী নির্জ্জীব হইয়াছে।

বরকন্দাজেরা দেখিল, ছিপগুলি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে—বজরা ঘেরিবে! বরকন্দাজ দৌড়াইল—"রাণীজি-কি জয়" বলিয়া, তাহারাও বজরা ঘেরিতে চলিল। তাহারা আসিয়া আগে বজরা ঘেরিল—ছিপ তাহাদের ঘেরিল। আর যে সময়ে শাঁক বাজিল, ঠিক সেই সময়ে জন কত বরকন্দাজ আসিয়া বজরার উপর উঠিল। তাহারা বজরার মাঝি মাল্লা—নৌকার কাজ করে, আবশ্যকমত লাঠি সড়কিও চালায়। তাহারা আপাততঃ লড়ায়ে প্রবৃত্ত হইবার কোন ইচ্ছা দেখাইল না। দাঁড়ে হালে, পালের রসি ধরিয়া, লগি ধরিয়া, যাহার যে স্থান, সেইখানে বসিল। আরও অনেক বরকন্দাজ বজরায় উঠিল। তিন চারি শ বরকন্দাজ তীরে রহিল—সেইখান হইতে ছিপের উপর সড়কি চালাইতে লাগিল। কতক সিপাহী ছিপ হইতে নামিয়া, বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। যে বরকন্দাজেরা বজরা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অবশিষ্ট সিপাহীরা তাহাদের উপর পড়িল। সর্ব্বত্র হাতাহাতি লড়াই হইতে লাগিল। তখন মারামারি, কাটাকাটি, চেঁচাচেঁচি, বন্দুকের হুড়মুড়, লাঠির ঠক্ঠকি, ভারি হুলস্থুল পড়িয়া গেল; কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না—কেহ কোন স্থানে স্থির হইতে পারে না।

দূর হইতে লড়াই হইলে সিপাহীর কাছে লাঠিয়ালেরা অধিকক্ষণ টিকিত না—কেন না, দূরে লাঠি চলে না। কিন্তু ছিপের উপর থাকিতে হওয়ায় সিপাহীদের বড় অসুবিধা হইল। যাহারা তীরে উঠিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সে সিপাহীরা লাঠিয়ালদিগকে সঙ্গীনের মুখে হটাইতে লাগিল, কিন্তু যাহারা জলে লড়াই করিতেছিল, তাহারা বরকন্দাজদিগের লাঠি সড়কিতে হাত পা বা মাথা ভাঙ্গিয়া কাবু হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিবার অল্পমাত্র পরেই এই ব্যাপার আরম্ভ হইল। প্রফুল্ল মনে করিল, "হয় ভবানী ঠাকুরের কাছে আমার কথা পৌঁছে নাই—নয় তিনি আমার কথা রাখিলেন না; মনে করিয়াছেন, আমি মরিতে পারিব না। ভাল, আমার কাজটাই তিনি দেখুন।"

দেবীর রাণীগিরিতে গুটিকতক চমৎকার গুণ জন্মিয়াছিল। তার একটি এই যে, যে সামগ্রীর কোন প্রকার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা আগে গুছাইয়া হাতের কাছে রাখিতেন। এ গুণের পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। দেবী এখন হাতের কাছেই পাইলেন—একটি সাদা নিশান। সাদা নিশানটি বাহিরে লইয়া গিয়া স্বহস্তে উঁচু করিয়া ধরিলেন।

সেই নিশান দেখাইবামাত্র লড়াই একেবারে বন্ধ হইল। যে যেখানে ছিল, সে সেই-খানেই হাতিয়ার ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝড় তুফান যেন হঠাৎ থামিয়া গেল, প্রমত্ত সাগর যেন অকস্মাৎ প্রশান্ত হ্রদে পরিণত হইল।

দেবী দেখিল, পাশে ব্রজেশ্বর। এই যুদ্ধের সময়ে দেবীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া, ব্রজেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। দেবী তাঁহাকে বলিল, "তুমি এই নিশান এইরূপ ধরিয়া থাক। আমি ভিতরে গিয়া নিশি ও দিবার সঙ্গে একটা পরামর্শ আঁটিব। রঙ্গরাজ যদি এখানে আসে, তাহাকে বলিও, সে দরওয়াজা হইতে আমার হুকুম লয়।"

এই বলিয়া দেবী ব্রজেশ্বরের হাতে নিশান দিয়া চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর নিশান তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সেখানে রঙ্গরাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গরাজ ব্রজেশ্বরের হাতে সাদা নিশান দেখিয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "তুমি কার হুকুমে সাদা নিশান দেখাইলে।"

ব্রজ। রাণীজির হুকুম।

রঙ্গ। রাণীজির হুকুম? তুমি কে?

ব্রজ। চিনিতে পার না?

রঙ্গরাজ একটু নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "চিনিয়াছি। তুমি ব্রজেশ্বরবাবু? এখানে কি মনে করে? বাপ বেটায় এক কাজে না কি? কেহ একে বাঁধ।"

রঙ্গরাজের ধারণা হইল যে, হরবল্লভের ন্যায় দেবীকে ধরাইয়া দিবার জন্যই ব্রজেশ্বর কোন ছলে বজরায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার আজ্ঞা পাইয়া দুই জন ব্রজেশ্বরকে বাঁধিতে আসিল। ব্রজেশ্বর কোন আপত্তি করিলেন না, বলিলেন, "আমায় বাঁধ, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কথা বুঝাইয়া দাও। সাদা নিশান দেখিয়াই দুই দলে যুদ্ধ বন্ধ করিল কেন?"

রঙ্গরাজ বলিল, "কচি খোকা আর কি? জান না, সাদা নিশান দেখাইলে ইংরেজের আর যুদ্ধ করিতে নাই?"

ব্র। তা আমি জানিতাম না। তা আমি জানিয়াই করি, আর না জানিয়াই করি, রাণীজির হুকুম মত সাদা নিশান দেখাইয়াছি কি না, তুমি না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আর তোমায়ও আজ্ঞা আছে যে, তুমি দরওয়াজা হইতে রাণীজির হুকুম লইবে।

রঙ্গরাজ বরাবর কামরার দরজায় গেল। কামরার দরওয়াজা বন্ধ আছে দেখিয়া বাহির হইতে ডাকিল, "রাণী মা!"

ভিতর হইতে উত্তর, "কে, রঙ্গরাজ?"

রঙ্গ। আজ্ঞা হাঁ—একটা সাদা নিশান আমাদের বজরা হইতে দেখান হইয়াছে—লড়াই সেই জন্য বন্ধ আছে।

ভিতর হইতে—"সে আমারই হুকুম মত হইয়াছে। এখন তুমি ঐ সাদা নিশান লইয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাহেবের কাছে যাও। গিয়া বল যে, লড়ায়ে প্রয়োজন নাই, আমি ধরা দিব।"

রঙ্গ। আমার শরীর থাকিতে তাহা কিছুতেই হইবে না।

দেবী। শরীরপাত করিয়াও আমায় রক্ষা করিতে পারিবে না।

রঙ্গ। তথাপি শরীরপাত করিব।

দেবী। শোন, মূর্খের মত গোল করিও না। তোমরা প্রাণ দিয়া আমায় বাঁচাইতে পারিবে না—এ সিপাহীর বন্দুকের কাছে লাঠি সোঁটা কি করিবে?

রঙ্গ। কি না করিবে?

দেবী। যাই করুক—আর এক বিন্দু রক্তপাত হইবার আগে আমি প্রাণ দিব,—বাহিরে গিয়া গুলির মুখে দাঁড়াইব—রাখিতে পারিবে না। বরং এখন আমি ধরা দিলে, পলাইবার ভরসা রহিল। বরং এক্ষণে আপন আপন প্রাণ রাখিয়া সুবিধা মত যাহাতে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সে চেষ্টা করিও। আমার অনেক টাকা আছে। কোম্পানির লোক সকল অর্থের বশ—আমার পলাইবার ভাবনা কি?

দেবী মুহূর্ত্ত জন্যও মনে করেন নাই যে, ঘুষ দিয়া তিনি পলাইবেন। সে রকম পলাইবার ইচ্ছাও ছিল না। এ কেবল রঙ্গরাজকে ভুলাইতেছিলেন। তাঁর মনের ভিতর যে গভীর কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল, রঙ্গরাজের বুঝিবার সাধ্য ছিল না—সুতরাং রঙ্গরাজকে তাহা বুঝাইলেন না। সরলভাবে ইংরেজকে ধরা দিবেন, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ আপনার বুদ্ধিতে সব খোয়াইবে। ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে, শত্রুর কোন অনিষ্ট করিবেন না, বরং শত্রুকে সতর্ক করিয়া দিবেন। তবে স্বামী, শ্বশুর, সখীদিগের উদ্ধারের জন্য যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাও করিবেন; যাহা যাহা হইবে, দেবী যেন দর্পণের ভিতর সকল দেখিতে পাইতেছিলেন।

রঙ্গরাজ বলিল, "যাহা দিয়া কোম্পানির লোক বশ করিবেন, তাহা ত বজরাতেই আছে। আপনি ধরা দিলে, ইংরেজ বজরাও লইবে।"

দেবী। সেইটি নিষেধ করিও। বলিও যে, আমি ধরা দিব, কিন্তু বজরা দিব না; বজরায় যাহা আছে, তাহার কিছুই দিব না; বজরায় যাহারা আছে, তাহাদের কাহাকেও তিনি ধরিতে পারিবেন না। এই নিয়মে আমি ধরা দিতে রাজি।

রঙ্গ। ইংরেজ যদি না শুনে, যদি বজরা লুঠিতে আসে।

দেবী। বারণ করিও—বজরায় না আসে, বজরা না স্পর্শ করে। বলিও যে, তাহা করিলে ইংরেজের বিপদ্ ঘটিবে। বজরায় আসিলে আমি ধরা দিব না। যে মুহূর্ত্তে ইংরেজ বজরায় উঠিবে, সেই দণ্ডে আবার যুদ্ধ আরম্ভ জানিবেন। আমার কথায় তিনি স্বীকৃত হইলে, তাঁহাদের কাহাকে এখানে আসিতে হইবে না। আমি নিজে তাঁহার ছিপে যাইব।

রঙ্গরাজ বুঝিল, ভিতরে একটা কি গভীর কৌশল আছে। দৌত্যে স্বীকৃত হইল। তখন দেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবানী ঠাকুর কোথায়?"

রঙ্গ। তিনি তীরে বরকন্দাজ লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। আমার কথা শোনেন নাই। বোধ করি, এখনও সেইখানে আছেন।

দেবী। আগে তাঁর কাছে যাও। সব বরকন্দাজ লইয়া নদীর তীরে তীরে স্বস্থানে যাইতে বল। বলিও যে, আমার বজরার লোকগুলি রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে। আর বলিও যে, আমার রক্ষার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই—আমার রক্ষার জন্য ভগবান্ উপায় করিয়াছেন। ইহাতে যদি তিনি আপত্তি করেন, আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতে বলিও—তিনি বুঝিতে পারিবেন।

রঙ্গরাজ তখন স্বয়ং আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, বৈশাখী নবীন নীরদমালায় গগন অন্ধকার হইয়াছে।

রঙ্গরাজ বলিল, "মা! আর একটা আজ্ঞার প্রার্থনা করি। হরবল্লভ রায় আজিকার গোইন্দা। তার ছেলে ব্রজেশ্বরকে নৌকায় দেখিলাম। অভিপ্রায়টা মন্দ, সন্দেহ নাই। তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি।"

শুনিয়া নিশি ও দিবা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেবী বলিল, "বাঁধিও না। এখন গোপনে ছাদের উপর বসিয়া থাকিতে বল। পরে যখন দিবা নামিতে হুকুম দিবে, তখন নামিবেন।"

আজ্ঞামত রঙ্গরাজ আগে ব্রজেশ্বরকে ছাদে বসাইল। তার পর ভবানী ঠাকুরের কাছে গেল, এবং দেবী যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিল। রঙ্গরাজ মেঘ দেখাইল—ভবানী

দেখিল। ভবানী আর আপত্তি না করিয়া, তীরের ও জলের বর্‌কন্দাজ সকল জমা করিয়া লইয়া, ত্রিস্রোতার তীরে তীরে স্বস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিল।

এদিকে দিবা ও নিশি, এই অবসরে বাহিরে আসিয়া, বর্‌কন্দাজবেশী দাঁড়ী মাঝিদিগকে চুপি চুপি কি বলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এদিকে ভবানী ঠাকুরকে বিদায় দিয়া, রঙ্গরাজ সাদা নিশান হাতে করিয়া, জলে নামিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাহেবের ছিপে গিয়া উঠিল। সাদা নিশান হাতে দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। সে ছিপে উঠিলে, সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তোমরা সাদা নিশান দেখাইয়াছ, ধরা দিবে?"

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব কি? যাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছেন, তিনিই ধরা দিবেন, সেই কথা বলিতে আসিয়াছি।

সাহেব। দেবী চৌধুরাণী ধরা দিবেন?

রঙ্গ। দিবেন। তাই বলিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সা। আর তোমরা?

রঙ্গ। আমরা কারা?

সা। দেবী চৌধুরাণীর দল।

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব না।

সা। আমি দলশুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছি।

রঙ্গ। এই দল কারা? কি প্রকারে এই হাজার বর্‌কন্দাজের মধ্যে দল বেদল চিনিবেন?

যখন রঙ্গরাজ এই কথা বলিল, তখন ভবানী ঠাকুর বর্‌কন্দাজ সৈন্য লইয়া চলিয়া যান নাই। যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সাহেব বলিল, "এই হাজার বর্‌কন্দাজ সবাই ডাকাইত; কেন না, উহারা ডাকাইতের হইয়া সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।"

রঙ্গরাজ। উহারা যুদ্ধ করিবে না, চলিয়া যাইতেছে দেখুন।

সাহেব দেখিলেন, বর্‌কন্দাজ সৈন্য পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সাহেব তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! তোমরা সাদা নিশানের ভাণ করিয়া পলাইতেছ?"

রঙ্গরাজ। সাহেব, ধরিলে কবে যে পলাইলাম ? এখনও কেহ পলায় নাই। পার, ধর। সাদা নিশান ফেলিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সাদা নিশান ফেলিয়া দিল। কিন্তু সিপাহীরা সাহেবের আজ্ঞা না পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

সাহেব ভাবিতেছিলেন, "উহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া বৃথা। পিছু ছুটিতে ছুটিতে উহারা নিবিড় জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিবে। একে রাত্রিকাল, তাহাতে মেঘাড়ম্বর, জঙ্গলে ঘোর অন্ধকার সন্দেহ নাই। আমার সিপাহীরা পথ চেনে না, বর্‌কন্দাজেরা পথ চেনে। সুতরাং তাহাদের ধরা সিপাহীর সাধ্য নহে।" কাজেই সাহেব সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "যাক্, উহাদের চাই না। যে কথা হইতেছিল, তাই হোক, তোমরা সকলে ধরা দিবে ?"

রঙ্গ। এক জনও না। কেবল দেবী রাণী।

সাহেব। পীষ্! এখন আর লড়াই করিবে কে ?. এই যে কয় জন, তাহারা কি আর পাঁচ শ সিপাহীর সঙ্গে লড়াই করিতে পারিবে ? তোমার বর্‌কন্দাজ সেনা ত জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল, দেখিতেছি।

রঙ্গরাজ দেখিল, বাস্তবিক ভবানী ঠাকুরের সেনা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল।

রঙ্গরাজ বলিল, "আমি অত জানি না। আমায় আমাদের প্রভু যা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। বজরা পাইবেন না, বজরায় যে ধন, তাহা পাইবেন না, আমাদের কাহাকেও পাইবেন না। কেবল দেবী রাণীকে পাইবেন।

সা। কেন ?

রঙ্গ। তা জানি না।

সা। জান আর নাই জান, বজরা এখন আমার, আমি উহা দখল করিব।

রঙ্গ। সাহেব, বজরাতে উঠিও না, বজরা ছুঁইও না, বিপদ্ ঘটিবে।

সা। পুঃ! পাঁচ শ সিপাহী লইয়া তোমাদের জন দুই চারি লোকের কাছে বিপদ্!

এই বলিয়া সাহেব সাদা নিশান ফেলিয়া দিলেন। সিপাহীদের হুকুম দিলেন, "বজরা ঘেরাও কর।"

সিপাহীরা পাঁচখানা ছিপ সমেত বজরা ঘেরিয়া ফেলিল। তখন সাহেব বলিলেন, "বজরার উপর উঠিয়া বর্‌কন্দাজদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লও।"

এ হুকুম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে দিলেন। কথা দেবীর কানে গেল। দেবীও বজরার ভিতর

হইতে উচ্চৈঃস্বরে হুকুম দিলেন, "বজরায় যাহার যাহার হাতে হাতিয়ার আছে, সব জলে ফেলিয়া দাও।"

শুনিবামাত্র, বজরায় যাহার যাহার হাতে অস্ত্র ছিল, সব জলে ফেলিয়া দিল। রঙ্গরাজও আপনার অস্ত্র সকল জলে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "চল, এখন বজরায় গিয়া দেখি, কি আছে?"

রঙ্গ। সাহেব, আপনি জোর করিয়া বজরায় যাইতেছেন, আমার দোষ নাই।

সা। তোমার আবার দোষ কি?

এই বলিয়া সাহেব একজন মাত্র সিপাহী সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে বজরায় উঠিলেন। এটা বিশেষ সাহসের কাজ নহে; কেন না, বজরার উপর যে কয়জন লোক ছিল, তাহারা সকলেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। সাহেব বুঝেন নাই যে, দেবীর স্থিরবুদ্ধিই শাণিত মহাস্ত্র; তার অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাই

সাহেব রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার দরজায় আসিলেন। দ্বার তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে দুই জনেই বিস্মিত হইলেন।

দেখিলেন, যেদিন প্রথম ব্রজেশ্বর বন্দী হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিন যেমন ইহার মনোহর সজ্জা, আজিও সেইরূপ; দেয়ালে তেমনি চারু চিত্র। তেমনি সুন্দর গালিচা পাতা। তেমনি আতরদান, গোলাবপাশ, তেমনি সোনার পুষ্পপাত্রে ফুল ভরা, সোনার আলবোলায় তেমনি মৃগনাভিগন্ধি তামাকু সাজা। তেমনি রূপার পুতুল, রূপার ঝাড়, সোনার শিকলে দোলান সোনার প্রদীপ। কিন্তু আজ একটা মসনদ নয়—দুইটা। দুইটা মসনদের উপর সুবর্ণমণ্ডিত উপাধানে দেহ রক্ষা করিয়া, দুইটি সুন্দরী রহিয়াছে। তাহাদের পরিধানে মহার্ঘ বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে মহামূল্য রত্নভূষা। সাহেব তাদের চেনে না—রঙ্গরাজ চিনিল। চিনিল যে, একজন নিশি—আর একজন দিবা।

সাহেবের জন্য একখানা রূপার চৌকি রাখা হইয়াছিল, সাহেব তাহাতে বসিলেন। রঙ্গরাজ খুঁজিতে লাগিলেন, দেবী কোথা? দেখিলেন, কামরার এক ধারে দেবীর সহজ বেশে দেবী দাঁড়াইয়া আছে, গড়া পরা, কেবল কড় হাতে, এলোচুল, কোন বেশভূষা নাই।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দেবী চৌধুরাণী? কাহার সঙ্গে কথা কহিব?"

নিশি বলিল, "আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। আমি দেবী।"

দিবা হাসিল, বলিল, "ইংরেজ দেখিয়া রঙ্গ করিতেছিস্? এ কি রঙ্গের সময়?

লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব! আমার এ ভগিনী কিছু রঙ্গ তামাসা ভাল বাসে, কিন্তু এ তার সময় নয়। আপনি আমার সঙ্গে কথা কহিবেন—আমি দেবী চৌধুরাণী।”

নিশি বলিল, “আ মরণ! তুই কি আমার জন্য ফাঁসি যেতে চাস্‌ না কি?” সাহেবের দিকে ফিরিয়া নিশি বলিল, “সাহেব, ও আমার ভগিনী—বোধ হয়, স্নেহবশতঃ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে প্রতারণা করিতেছে। কিন্তু কেমন করিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, বহিনের প্রাণদণ্ড করিয়া, আপনার প্রাণ রক্ষা করিব? প্রাণ অতি তুচ্ছ, আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, অক্লেশে ত্যাগ করিতে পারি। চলুন, আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন, যাইতেছি। আমিই দেবী রাণী।”

দিবা বলিল, “সাহেব! তোমার যিশু খ্রীষ্টের দিব্য, তুমি যদি নিরপরাধিনীকে ধরিয়া লইয়া যাও। আমি দেবী।”

সাহেব বিরক্ত হইয়া রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি তামাসা? কে দেবী চৌধুরাণী, তুমি যথার্থ বলিবে?”

রঙ্গরাজ কিছু বুঝিল না, কেবল অনুভব করিল যে, ভিতরে একটা কি কৌশল আছে। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া সে নিশিকে দেখাইয়া, হাতযোড় করিয়া বলিল, “হুজুর! এই যথার্থ দেবী রাণী।”

তখন দেবী প্রথম কথা কহিল। বলিল, “আমার ইহাতে কথা কহা বড় দোষ। কিন্তু কি জানি, এর পর মিছা কথা ধরা পড়িলে, যদি সকলে মারা যায়, তাই বলিতেছি, এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য নহে।” পরে নিশিকে দেখাইয়া বলিল, “এ দেবী নহে। যে উহাকে দেবী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সে রাণীজিকে মা বলে, রাণীজিকে মার মত ভক্তি করে, এই জন্য সে রাণীজিকে বাঁচাইবার জন্য অন্য ব্যক্তিকে নিশান দিতেছে।”

তখন সাহেব দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবী তবে কে?”

দেবী বলিল, “আমি দেবী।”

দেবী এই কথা বলিলে নিশিতে, দিবাতে, রঙ্গরাজে ও দেবীতে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। নিশি বলে, “আমি দেবী,” দিবা বলে, “আমি দেবী,” রঙ্গরাজ নিশিকে বলে, “এই দেবী,” দেবী বলে, “আমি দেবী।” বড় গোলমাল্‌।

তখন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব মনে করিলেন, এ ফেরেব্‌বাজির একটা চূড়ান্ত করা উচিত। বলিলেন, “তোমাদের দুই জনের মধ্যে এক জন দেবী চৌধুরাণী বটে। ওটা চাকরাণী, ওটা দেবী নহে। এই দুই জনের মধ্যে কে সে পাপিষ্ঠা, তাহা তোমরা চাতুরী করিয়া আমাকে জানিতে

দিতেছ না। কিন্তু তাহাতে তোমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। আমি এখন দুই জনকেই ধরিয়া লইয়া যাইব। ইহার পর প্রমাণের দ্বারা যে দেবী চৌধুরাণী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, সেই ফাঁসি যাইবে। যদি প্রমাণের দ্বারা এ কথা পরিষ্কার না হয়, তবে দুই জনেই ফাঁসি যাইবে।"

তখন নিশি ও দিবা দুই জনেই বলিল, "এত গোলযোগে কাজ কি? আপনার সঙ্গে কি গোইন্দা নাই? যদি গোইন্দা থাকে, তবে তাহাকে ডাকাইলেই ত সে বলিয়া দিতে পারিবে,—কে যথার্থ দেবী চৌধুরাণী।"

হরবল্লভকে বজরায় আনিবে, দেবীর এই প্রধান উদ্দেশ্য। হরবল্লভের রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, দেবী আত্মরক্ষার উপায় করিবে না, ইহা স্থির। তাঁহাকে বজরায় না আনিতে পারিলে হরবল্লভের রক্ষার নিশ্চয়তা হয় না।

সাহেব মনে করিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নহে।" তখন তাঁহার সঙ্গে যে সিপাহী আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, "গোইন্দাকে ডাক।" সিপাহী এক ছিপের এক জন জমাদ্দার সাহেবকে ডাকিয়া বলিল, "গোইন্দাকে ডাক।" তখন গোইন্দাকে ডাকাডাকির গোল পড়িয়া গেল। গোইন্দা কোথায়, গোইন্দা কে, তাহা কেহই জানে না, কেবল চারি দিকে ডাকাডাকি করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বস্তুতঃ হরবল্লভ রায় মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, ঘটনাধীন। প্রথমে বড় ঘেঁষেন নাই। "শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণীনাং" ইত্যাদি চাণক্যপ্রদত্ত সদুপদেশ স্মরণ করিয়া, তিনি সিপাহীদিগের ছিপে উঠেন নাই। একখানা পৃথক্ ডিঙ্গিতে থাকিয়া, লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাহেবকে বজরা দেখাইয়া দিয়া, অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে পলাইয়া গিয়া ডিঙ্গী ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তার পর দেখিলেন, আকাশে বড় ঘনঘটা। মনে করিলেন, ঝড় উঠিবে ও এখনই আমার ডিঙ্গী ডুবিয়া যাইবে, টাকার লোভে আসিয়া আমি প্রাণ হারাইব—আমার সৎকারও হইবে না। তখন রায় মহাশয় ডিঙ্গী হইতে তীরে অবতরণ করিলেন। কিন্তু তীরে সেখানে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া বড় ভয় হইল। সাপের ভয়, বাঘের ভয়, চোর ডাকাইতের ভয়, ভূতেরও ভয়। হরবল্লভের মনে হইল, কেন এমন ঝক্‌মারি করিতে আসিয়াছিলাম। হরবল্লভের কান্না আসিল।

এমন সময়ে হঠাৎ বন্দুকের হুড়মুড়ি, সিপাহী বরকন্দাজের হৈ হৈ শব্দ সব বন্ধ হইয়া

গেল। হরবল্লভের বোধ হইল, অবশ্য সিপাহীর জয় হইয়াছে, ডাকাইত মাগী ধরা পড়িয়াছে, নহিলে লড়াই বন্ধ হইবে কেন? তখন হরবল্লভ ভরসা পাইয়া যুদ্ধস্থানে যাইতে অগ্রসর হইলেন। তবে এ রাত্রিকালে, এ অন্ধকারে, এ বন জঙ্গলের মাঝে অগ্রসর হন কিরূপে? ডিঙ্গীর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাপু মাঝি,—বলি, ওদিকে যাওয়া যায় কিরূপে বল্‌তে পার?"

মাঝি বলিল, "যাওয়ার ভাবনা কি? ডিঙ্গীতে উঠুন না, নিয়ে যাচ্ছি। সিপাহীরা মারবে ধরবে না ত? আবার যদি লড়াই বাধে?"

হর। সিপাহীরা আমাদের কিছু বলিবে না। লড়াই আর বাধিবে না—ডাকাইত ধরা পড়েছে। কিন্তু যে রকম মেঘ করেছে, এখনই ঝড় উঠ্‌বে—ডিঙ্গীতে উঠি কিরূপে?

মাঝি বলিল, "ঝড়ে ডিঙ্গী কখন ডুবে না।"

হরবল্লভ প্রথমে সে সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন না—শেষ অগত্যা ডিঙ্গীতে উঠিলেন। মাঝিকে উপদেশ দিলেন, কেনারায় কেনারায় ডিঙ্গী লইয়া যাইবে। মাঝি তাহাই করিল। শীঘ্র আসিয়া ডিঙ্গী বজরায় লাগিল। হরবল্লভ সিপাহীদের সঙ্কেতবাক্য জানিতেন, সুতরাং সিপাহীরা আপত্তি করিল না। সেই সময়ে "গোইন্দা! গোইন্দা!" করিয়া ডাকাডাকি হইতেছিল। হরবল্লভ বজরায় উঠিয়া সম্মুখস্থ আরদালির সিপাহীকে বলিল, "গোইন্দাকে খুঁজিতেছ? আমি গোইন্দা।"

সিপাহী বলিল, "তোমাকে কাপ্তেন সাহেব তলব করিয়াছেন।"

হর। কোথায় তিনি?

সিপা। কামরার ভিতর। তুমি কামরার ভিতর যাও।

হরবল্লভ আসিতেছে জানিতে পারিয়া, দেবী প্রস্থানের উদ্যোগ দেখিল। "কাপ্তেন সাহেবের জন্য কিছু জলযোগের উদ্যোগ দেখি" বলিয়া ভিতরের কামরায় চলিয়া গেল।

এদিকে হরবল্লভ কামরার দিকে গেলেন। কামরার দ্বারে উপস্থিত হইয়া কামরার সজ্জা ও ঐশ্বর্য্য, দিবা ও নিশির রূপ ও সজ্জা দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন। সাহেবকে সেলাম্ করিতে গিয়া, ভুলিয়া নিশিকে সেলাম্ করিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া নিশি কহিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! মেজাজ সরিফ্?"

শুনিয়া দিবা বলিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! আমায় একটা কুর্ণিস হলো না—আমি হলেম এদের রাণী।"

সাহেব হরবল্লভকে বলিলেন, "ইহারা ফেরেব্ করিয়া দুই জনেই বলিতেছে, 'আমি দেবী

চৌধুরাণী।' কে দেবী চৌধুরাণী, তাহার ঠিকানা না হওয়ায়, আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। কে দেবী?"

হরবল্লভ বড় প্রমাদে পড়িলেন। ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষের ভিতর কখনও দেবীকে দেখেন নাই। কি করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে দেখাইয়া দিলেন। নিশি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া, 'ভুল হইয়াছে' বলিয়া হরবল্লভ দিবাকে দেখাইলেন। দিবা লহর তুলিয়া হাসিল। বিষণ্ণ মনে হরবল্লভ আবার নিশিকে দেখাইল। সাহেব তখন গরম হইয়া উঠিয়া, হরবল্লভকে বলিলেন, "টোম্ বড্‌জাট্—শূওর! তোম্ পছানৃটে নেহি?"

তখন দিবা বলিল, "সাহেব, রাগ করিবেন না। উনি চেনেন না। উঁহার ছেলে চেনে। উঁহার ছেলে বজরার ছাদে বসিয়া আছে, তাহাকে আনুন—সে চিনিবে।"

হরবল্লভ আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, "আমার ছেলে!"

দিবা। এইরূপ শুনি।

হর। ব্রজেশ্বর?

দিবা। তিনিই।

হর। কোথা?

দিবা। ছাদে।

হর। ব্রজ এখানে কেন?

দিবা। তিনি বলিবেন।

সাহেব হুকুম দিলেন, "তাঁহাকে আন।"

দিবা রঙ্গরাজকে ইঙ্গিত করিল। তখন রঙ্গরাজ ছাদে গিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "চল, দিবা ঠাকুরাণীর হুকুম।"

ব্রজেশ্বর নামিয়া কামরার ভিতর আসিল। দেবীর হুকুম আগেই প্রচার হইয়াছিল, দিবার হুকুম পাইলেই ব্রজেশ্বর ছাদ হইতে নামিবে। এমনই দেবীর বন্দোবস্ত।

সাহেব ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দেবী চৌধুরাণীকে চেন?"

ব্রজ। চিনি।

সাহেব। এখানে দেবী আছে?

ব্রজ। না।

সাহেব তখন রাগান্ধ হইয়া বলিলেন, "সে কি, ইহারা দুই জনের এক জনও দেবী চৌধুরাণী নয়?"

ব্র। এরা তার দাসী।

সা। এঃ! তুমি দেবীকে চেন?

ব্র। বিলক্ষণ চিনি।

সা। যদি এরা কেহ দেবী না হয়, তবে দেবী অবশ্য এ বজরার কোথাও লুকাইয়া আছে। বোধ হয়, দেবী সেই চাকরাণীটা। আমি বজরা তল্লাশী করিতেছি—তুমি নিশানদিহি করিবে, আইস।

ব্র। সাহেব, তোমার বজরা তল্লাশ করিতে হয়, কর—আমি নিশানদিহি করিব কেন?

সাহেব বিস্মিত হইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "কেঁও বদ্‌জাত্? তোম্ গোইন্দা নেহি?"

"নেহি।" বলিয়া ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে বিরাশী সিক্কার এক চপেটাঘাত করিল।

"করিলে কি? করিলে কি? সর্ব্বনাশ করিলে?" বলিয়া, হরবল্লভ কাঁদিয়া উঠিল।

"হুজুর! তুফান উঠা।" বলিয়া বাহির হইতে জোমাদ্দার হাঁকিল।

সোঁ সোঁ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে শুনা গেল।

কামরার ভিতর হইতে ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে—যে মুহূর্ত্তে সাহেবের গালে ব্রজেশ্বরের চড় পড়িল—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আবার শাঁক বাজিল। এবার দুই ফুঁ।

বজরার নোঙ্গর ফেলা ছিল না—পূর্ব্বে বলিয়াছি, খোঁটায় কাছি বাঁধা ছিল, খোঁটার কাছে দুই জন নাবিক বসিয়াছিল। যেমন শাঁক বাজিল, অমনি তাহারা কাছি ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল। তীরের উপরে যে সিপাহীরা বজরা ঘেরাও করিয়াছিল, তাহারা উহাদিগকে মারিবার জন্য সঙ্গীন উঠাইল—কিন্তু তাহাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিল, পলক ফেলিতে না ফেলিতে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া গেল। দেবীর কৌশলে এক পলক মধ্যে সেই পাঁচ শত কোম্পানির সিপাহী পরাস্ত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রথমাবধিই বজরায় চারিখানা পাল খাটান ছিল। বলিয়াছি যে, মধ্যে নিশি ও দিবা আসিয়া, নাবিকদিগকে কি উপদেশ দিয়া গিয়াছিল। সেই উপদেশ অনুসারেই খোঁটার কাছে লোক বসিয়াছিল। আর সেই উপদেশ অনুসারে পালের কাছির কাছে চারি জন নাবিক বসিয়াছিল। শাঁকের শব্দ শুনিবা মাত্র তাহারা পালের কাছি সকল টানিয়া ধরিল। মাঝি হাল আঁটিয়া ধরিল। অমনি সেই প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা আসিয়া চারিখানা পালে লাগিল। বজরা ঘুরিল—যে দুই জন সিপাহী সঙ্গীন তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গীন উঁচু হইয়া রহিল—বজরার মুখ পঞ্চাশ হাত তফাতে গেল। বজরা ঘুরিল—তার পর

ঝড়ের বেগে পালভরা বজরা কাত হইল, প্রায় ডুবে। লিখিতে এতক্ষণ লাগিল—কিন্তু এতখানা ঘটিল এক নিমেষ মধ্যে। সাহেব ব্রজেশ্বরের চড়ের প্রত্যুত্তরে ঘুষি উঠাইয়াছেন মাত্র, ইহারই মধ্যে এতখানা সব হইয়া গেল। তাঁহারও হাতের ঘুষি হাতে রহিল, যেমন বজরা কাত হইল, অমনি সাহেব টলিয়া মুষ্টিবদ্ধ-হস্তে দিবা সুন্দরীর পাদমূলে পতিত হইলেন। ব্রজেশ্বর খোদ সাহেবের ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেল—এবং রঙ্গলাল তাহার উপর পড়িয়া গেল। হরবল্লভ প্রথমে নিশিঠাকুরাণীর ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে পদচ্যুত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে রঙ্গরাজের নাগরা জুতায় আটকাইয়া গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, "নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে!"

কিন্তু নৌকা ডুবিল না—কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল। যাহারা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল—সাহেব আবার ঘুষি তুলিলেন। কিন্তু সাহেবের ফৌজ, যাহারা জলে দাঁড়াইয়াছিল, বজরা তাহাদের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। অনেকে জলে ডুবিয়া প্রাণরক্ষা করিল; কেহ দূর হইতে বজরা ঘুরিতেছে দেখিতে পাইয়া, পলাইয়া বাঁচিল; কেহ বা আহত হইল; কেহ মরিল না। ছিপগুলি বজরার নীচে পড়িয়া ডুবিয়া গেল—জল সেখানে এমন বেশী নহে—স্রোত বড় নাই—সুতরাং সকলেই বাঁচিল। কিন্তু বজরা আর কেহ দেখিতে পাইল না। নক্ষত্রবেগে উড়িয়া বজরা কোথায় ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে পাইল না। সিপাহী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইল। দেবী তাহাদের পরাস্ত করিয়া, পাল উড়াইয়া চলিল, লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাহেব ও হরবল্লভ দেবীর নিকট বন্দী হইল। নিমেষমধ্যে যুদ্ধ জয় হইল। দেবী তাই আকাশ দেখাইয়া বলিয়াছিল, "আমার রক্ষার উপায় ভগবান্ করিতেছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বজরা জলের রাশি ভাঙ্গিয়া, দুলিতে দুলিতে নক্ষত্র-বেগে ছুটিল। শব্দ ভয়ানক। বজরার মুখে ক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির গর্জ্জন ভয়ানক—ঝড়ের শব্দ ভয়ানক। কিন্তু নৌকার গঠন অনুপম, নাবিকদিগের দক্ষতা ও শিক্ষা প্রসিদ্ধ। নৌকা এই ঝড়ের মুখে চারিখানা পাল দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিল। আরোহিবর্গ যাঁহারা প্রথমে কুষ্মাণ্ডাকারে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে স্বপদস্থ হইলেন। হরবল্লভ রায় মহাশয়, অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়িত করিয়া, দুর্গানাম জপিতে

আরম্ভ করিলেন, আবার না ডুবি। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব সেই মুলতুবী ঘুষিটা আবার পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টায় হস্তোত্তোলন করিলেন, অমনি ব্রজেশ্বর তাঁর হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। হরবল্লভ ছেলেকে ভৎর্সনা করিলেন। বলিলেন, "ও কি কর, ইংরেজের গায়ে হাত তোল ?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "আমি ইংরেজের গায়ে হাত তুলেছি, না ইংরেজ আমার গায়ে তুলিতেছে ?"

হরবল্লভ সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর! ও ছেলেমানুষ, আজও বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি, আপনি ওর অপরাধ লইবেন না। মাফ করুন।"

সাহেব বলিলেন, "ও বড় বদ্‌মাস। তবে যদি আমার কাছে ও যোড়হাত করিয়া মাফ চায়, তবে আমি মাফ করিতে পারি'।"

হরবল্লভ। ব্রজ, তাই কর। যোড়হাত করিয়া সাহেবকে বল, "আমায় মাফ করুন।"

ব্রজেশ্বর। সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতার আজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে যোড়হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাফ করুন।

সাহেব ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া ব্রজেশ্বরকে ক্ষমা করিলেন; আর ব্রজেশ্বরের হাত লইয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিলেন। ব্রজেশ্বরের চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কখন জানে না, সেক্‌হ্যাণ্ড কাকে বলে—সুতরাং ব্রজেশ্বর একটু ভেকা হইয়া রহিল। মনে করিল, "কি জানি, যদি আবার বাঁধে।" এই ভাবিয়া ব্রজেশ্বর বাহিরে গিয়া বসিল। কেবল ঝড়,—বৃষ্টি বড় নাই,—ভিজিতে হইল না।

রঙ্গরাজও বাহিরে আসিয়া, কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল—দুই দিকের পাহারায়। বিশেষ এ সময়ে বাহিরে একটু সতর্ক থাকা ভাল, বজরা বড় তীব্রবেগে যাইতেছে, হঠাৎ বিপদ্‌ ঘটাও বিচিত্র নহে।

দিবা উঠিয়া দেবীর কাছে গেল—পুরুষ-মহলে এখন আর প্রয়োজন নাই। নিশি উঠিল না—তার কিছু মতলব ছিল। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত—সুতরাং অগাধ সাহস।

সাহেব ঝাঁকিয়া আবার রূপার চৌকিতে বসিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, "ডাকাইতের হাত হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? যাহাকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, তাহারই কাছে ধরা পড়িলাম—স্ত্রীলোকের কাছে পরাজিত হইলাম, ইংরেজ-মহলে আর কি বলিয়া মুখ দেখাইব ? আমার না ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।"

হরবল্লভ আর বসিবার স্থান না পাইয়া নিশি সুন্দরীর মসনদের কাছে বসিলেন। দেখিয়া নিশি বলিল, "আপনি একটু নিদ্রা যাবেন ?"

হর। আজ কি আর নিদ্রা হয় ?

নিশি। আজ না হইল ত আর হইল না।

হর। সে কি ?

নিশি। আবার ঘুমাইবার দিন কবে পাইবেন ?

হর। কেন ?

নিশি। আপনি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন ?

হর। তা—তা—কি জান—

নিশি। ধরা পড়িলে দেবীর কি হইত, জান ?

হর। আ—এমন কি—

নিশি। এমন কিছু নয়, ফাঁসি !

হর। তা—না—এই—তা কি জান—

নিশি। দেবী তোমার কোন অনিষ্ট করে নাই, বরং ভারী উপকার করিয়াছিল—যখন তোমার জাতি যায়, প্রাণ যায়, তখন তোমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়া, তোমায় রক্ষা করিয়াছিল। তার প্রত্যুপকারে তুমি তাহাকে ফাঁসি দিবার চেষ্টায় ছিলে। তোমার যোগ্য কি দণ্ড বল দেখি ?

হরবল্লভ চুপ করিয়া রহিল।

নিশি বলিতে লাগিল, "তাই বলিতেছিলাম, এই বেলা ঘুমাইয়া লও—আর রাত্রের মুখ দেখিবে না। নৌকা কোথায় যাইতেছে বল দেখি ?"

হরবল্লভের কথা কহিবার শক্তি নাই।

নিশি বলিতে লাগিল, "ডাকিনীর শ্মশান বলিয়া এক প্রকাণ্ড শ্মশান আছে। আমরা যাদের প্রাণে মারি, তাদের সেইখানে লইয়া গিয়া মারি। বজরা এখন সেইখানে যাইতেছে। সেইখানে পৌছিলে সাহেব ফাঁসি যাইবে, রাণীজির হুকুম হইয়া গিয়াছে। আর তোমায় কি হুকুম হইয়াছে, জান ?"

হরবল্লভ কাঁদিতে লাগিল—যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমায় রক্ষা কর।"

নিশি বলিল, "তোমায় রক্ষা করিবে, এমন পাষণ্ড পামর কে আছে ? তোমায় শূলে দিবার হুকুম হইয়াছে।"

হরবল্লভ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঝড়ের শব্দ বড় প্রবল ; সে কান্নার শব্দ ব্রজেশ্বর শুনিতে পাইল না—দেবীও না। সাহেব শুনিল। সাহেব কথাগুলা শুনিতে পায় নাই—

কান্না শুনিতে পাইল। সাহেব ধমকাইল, "রোও মৎ—উল্লুক। মরনা এক রোজ আল্‌বৎ হ্যায়।"

সে কথা কানে না তুলিয়া, নিশির কাছে যোড়হাত করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "হাঁ গা! আমায় কি কেউ রক্ষা করিতে পারে না গা?"

নিশি। তোমার মত নরাধমকে বাঁচাইয়া কে পাতকগ্রস্ত হইবে? আমাদের রাণী দয়াময়ী, কিন্তু তোমার জন্য কেহই তাঁর কাছে দয়ার ভিক্ষা করিব না।

হর। আমি লক্ষ টাকা দিব।

নিশি। মুখে আনিতে লজ্জা করে না? পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য এই কৃতঘ্নের কাজ করিয়াছ—আবার লক্ষ টাকা হাঁক?

হর। আমাকে যা বলিবে, তাই করিব।

নিশি। তোমার মত লোকের দ্বারা কোন্ কাজ হয় যে, তুমি, যা বলিব, তাই করিবে?

হর। অতি ক্ষুদ্রের দ্বারাও উপকার হয়—ওগো, কি করিতে হইবে বল, আমি প্রাণপণ করিয়া করিব—আমায় বাঁচাও।

নিশি। (ভাবিতে ভাবিতে) তোমার দ্বারাও আমার একটা উপকার হইলে হইতে পারে—তা তোমার মত লোকের দ্বারা সে উপকার না হওয়াই ভাল।

হর। তোমার কাছে যোড়হাত করিতেছি—তোমার হাতে ধরিতেছি—

হরবল্লভ বিহ্বল—নিশি ঠাকুরাণীর বাঁউড়ী-পরা গোলগাল হাতখানি প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কি! চতুরা নিশি আগে হাত সরাইয়া লইল—বলিল, "সাবধান! ও হাত শ্রীকৃষ্ণের গৃহীত। কিন্তু তোমার হাতে পায়ে ধরিয়া কাজ নাই—তুমি যদি এতই কাতর হইয়াছ, তবে তুমি যাতে রক্ষা পাও, আমি তা করিতে রাজি হইতেছি। কিন্তু তোমায় যা বলিব, তা যে তুমি করিবে, এ বিশ্বাস হয় না। তুমি জুয়াচোর, কৃতঘ্ন, পামর, গোইন্দাগিরি কর—তোমার কথায় বিশ্বাস কি?"

হর। যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিতেছি।

নিশি। তোমার আবার দিব্য? কি দিব্য করিবে?

হর। গঙ্গাজল তামা তুলসী দাও—আমি স্পর্শ করিয়া দিব্য করিতেছি।

নিশি। ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতে পার?

হরবল্লভ গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল, "তোমাদের যা ইচ্ছা, তাহা কর। আমি তা পারিব না।"

কিন্তু এ তেজ ক্ষণিকমাত্র। হরবল্লভ আবার তখনই হাত কচ্‌লাইতে লাগিল—বলিল, “আর যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিব, রক্ষা কর।”

নিশি। আচ্ছা, দিব্য করিতে হইবে না—তুমি আমাদের হাতে আছ। শোন, আমি বড় কুলীনের মেয়ে। আমাদের ঘরে পাত্র যোটা ভার। আমার একটি পাত্র যুটিয়াছিল, (পাঠক জানেন, সব মিথ্যা) কিন্তু আমার ছোট বহিনের যুটিল না। আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই।

হর। বয়স কত হইয়াছে ?

নিশি। পঁচিশ ত্রিশ।

হর। কুলীনের মেয়ে অমন অনেক থাকে।

নিশি। থাকে, কিন্তু আর তার বিবাহ না হইলে অঘরে পড়িবে, এমন গতিক হইয়াছে। তুমি আমার বাপের পালটি ঘর। তুমি যদি আমার ভগিনীকে বিবাহ কর, আমার বাপের কুল থাকে। আমিও এই কথা বলিয়া রাণীজির কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লই।

হরবল্লভের মাথার উপর হইতে পাহাড় নামিয়া গেল। আর একটা বিবাহ বৈ ত নয়—সেটা কুলীনের পক্ষে শক্ত কাজ নয়—তা যত বড় মেয়েই হৌক্ না কেন! নিশি যে উত্তরের প্রত্যাশা করিয়াছিল, হরবল্লভ ঠিক্ সেই উত্তর দিল, বলিল, “এ আর বড় কথা কি ? কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। তবে একটা কথা এই, আমি বুড়া হইয়াছি, আমার আর বিবাহের বয়স নাই। আমার ছেলে বিবাহ করিলে হয় না ?”

নিশি। তিনি রাজি হবেন ?

হর। আমি বলিলেই হইবে।

নিশি। তবে আপনি কাল প্রাতে সেই আজ্ঞা দিয়া যাইবেন। তাহা হইলে, আমি পাল্কী বেহারা আনিয়া আপনাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। আপনি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করিবেন। আমরা বরের বিবাহ দিয়া বৌ সঙ্গে পাঠাইয়া দিব।

হরবল্লভ হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল—কোথায় শূলে যায়—কোথায় বৌভাতের ঘটা। হরবল্লভের আর দেরি সয় না। বলিল, “তবে তুমি গিয়া রাণীজিকে এ সকল কথা জানাও।”

নিশি বলিল, “চলিলাম।” নিশি দ্বিতীয় কামরার ভিতর প্রবেশ করিল।

নিশি গেলে, সাহেব হরবল্লভকে জিজ্ঞাসা করিল, “স্ত্রীলোকটা তোমাকে কি বলিতেছিল ?”

হর। এমন কিছুই না।

সাহেব। কাঁদিতেছিলে কেন ?

হর। কই ? কাঁদি নাই।

সাহেব। বাঙ্গালী এমনই মিথ্যাবাদী বটে।

নিশি ভিতরে আসিলে, দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার শ্বশুরের সঙ্গে এত কি কথা কহিতেছিলে ?"

নিশি। দেখিলাম, যদি তোমার শাশুড়ীগিরিতে বাহাল হইতে পারি।

দেবী। নিশি ঠাকুরাণি! তোমার মন প্রাণ, জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছ—কেবল জুয়াচুরিটুকু নয়। সেটুকু নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছ।

নিশি। দেবতাকে ভাল সামগ্রীই দিতে হয়। মন্দ সামগ্রী কি দিতে আছে ?

দেবী। তুমি নরকে পচিয়া মরিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

ঝড় থামিল; নৌকাও থামিল। দেবী বজরার জানেলা হইতে দেখিতে পাইলেন, প্রভাত হইতেছে। বলিলেন, "নিশি! আজ সুপ্রভাত!"

নিশি বলিল, "আমি আজ সুপ্রভাত!"

দিবা। তুমি অবসান, আমি সুপ্রভাত!

নিশি। যে দিন আমার অবসান হইবে, সেই দিনই আমি সুপ্রভাত বলিব। এ অন্ধকারের অবসান নাই। আজ বুঝিলাম, দেবী চৌধুরাণীর সুপ্রভাত—কেন না, আজ দেবী চৌধুরাণীর অবসান।

দিবা। ও কি কথা লো পোড়ারমুখী ?

নিশি। কথা ভাল। দেবী মরিয়াছে। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী চলিল।

দেবী। তার এখন দেরী ঢের। যা বলি, কর দেখি। বজরা বাঁধিতে বল দেখি।

নিশি হুকুম জারি করিল—মাঝিরা তীরে লাগাইয়া বজরা বাঁধিল। তার পর দেবী বলিল, "রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় আসিয়াছি ? রঙ্গপুর কত দূর ? ভূতনাথ কত দূর ?"

রঙ্গরাজ জিজ্ঞাসায় বলিল, "এক রাত্রে চারি দিনের পথ আসিয়াছি। রঙ্গপুর এখান হইতে অনেক দিনের পথ। ডাঙ্গা-পথে ভূতনাথে এক দিনে যাওয়া যাইতে পারে।"

"পাল্কী বেহারা পাওয়া যাইবে?"

"আমি চেষ্টা করিলে সব পাওয়া যাইবে।"

দেবী নিশিকে বলিল, "তবে আমার শ্বশুরকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দাও।"

দিবা। এত তাড়াতাড়ি কেন?

নিশি। শ্বশুরের ছেলে সমস্ত রাত্রি বাহিরে বসিয়া আছে, মনে নাই? বাছাধন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিতে পারিতেছে না, দেখিতেছ না?

এই বলিয়া নিশি রঙ্গরাজকে ডাকিয়া, হরবল্লভের সাক্ষাতে বলিল, "সাহেবটাকে ফাঁসি দিতে হইবে। ব্রাহ্মণটাকে এখন শূলে দিয়া কাজ নাই। উহাকে পাহারাবন্দী করিয়া স্নানাহ্নিকে পাঠাইয়া দাও।"

হরবল্লভ বলিলেন, "আমার উপর হুকুম কিছু হইয়াছে?"

নিশি চোক টিপিয়া বলিল, "আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। তুমি স্নানাহ্নিক করিয়া আইস।"

নিশি রঙ্গরাজের কানে কানে বলিল, "পাহারা মানে জল-আচরণী ভৃত্য।" রঙ্গরাজ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হরবল্লভকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দিল।

তখন দেবী নিশিকে বলিল, "সাহেবটাকে ছাড়িয়া দিতে বল। সাহেবকে রঙ্গপুর ফিরিয়া যাইতে বল। রঙ্গপুর অনেক দূর, এক শত মোহর উহাকে পথখরচ দাও, নহিলে এত পথ যাইবে কি প্রকারে?"

নিশি শত স্বর্ণ লইয়া গিয়া রঙ্গরাজকে দিল, আর কানে কানে উপদেশ দিল। উপদেশে দেবী যাহা বলিয়াছিল, তাহা ছাড়া আরও কিছু ছিল।

রঙ্গরাজ তখন দুই জন বরকন্দাজ লইয়া আসিয়া সাহেবকে ধরিল। বলিল, "উঠ।"

সাহেব। কোথা যাইতে হইবে?

রঙ্গ। তুমি কয়েদী—জিজ্ঞাসা করিবার কে?

সাহেব বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গরাজের পিছু পিছু দুই জন বরকন্দাজের মাঝে চলিল। যে ঘাটে হরবল্লভ স্নান করিতেছিলেন, সেই ঘাট দিয়া তাহারা যায়।

হরবল্লভ জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেবকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

রঙ্গরাজ বলিল, "এই জঙ্গলে।"

হর। কেন?

রঙ্গ। জঙ্গলের ভিতর গিয়া উহাকে ফাঁসি দিব।

হরবল্লভের গা কাঁপিল। সে সন্ধ্যা-আহ্নিকের সব মন্ত্র ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যাহ্নিক ভাল হইল না।

রঙ্গরাজ জঙ্গলে সাহেবকে লইয়া গিয়া বলিল, "আমরা কাহাকে ফাঁসি দিই না। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমাদের পিছনে আর লেগো না। তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।"

সাহেব প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল—তার পর ভাবিল, "ইংরেজকে ফাঁসি দেয়, বাঙ্গালীর এত কি ভরসা ?"

তার পর রঙ্গরাজ বলিল, "সাহেব! রঙ্গপুর অনেক পথ, যাবে কি প্রকারে ?"

সাহেব। যে প্রকারে পারি।

রঙ্গ। নৌকা ভাড়া কর, নয় গ্রামে গিয়া ঘোড়া কেন—নয় পাল্কী কর। তোমাকে আমাদের রাণী এক শত মোহর পথখরচ দিয়াছেন।

রঙ্গরাজ মোহর গণিয়া দিতে লাগিল। সাহেব পাঁচ খান মোহর লইয়া আর লইল না। বলিল, "ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। এ আমি কর্জ্জ লইলাম।"

রঙ্গরাজ। আচ্ছা, আমরা যদি তোমার কাছে আদায় করতে যাই ত শোধ দিও। আর তোমার সিপাহী যদি কেহ জখম হইয়া থাকে, তবে তাহাকে পাঠাইয়া দিও। যদি কেহ মরিয়া থাকে, তবে তাদের ওয়ারেশকে পাঠাইয়া দিও।

সাহেব। কেন ?

রঙ্গ। এমন অবস্থায় রাণী কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন।

সাহেব বিশ্বাস করিল না। ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

রঙ্গরাজ তখন পাল্কী বেহারার সন্ধানে গেল। তার প্রতি সে আদেশও ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে পথ সাফ দেখিয়া, ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে দেবীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

দেবী বলিল, "ভাল হইল, দেখা দিলে। তোমার কথা ভিন্ন আজিকার কাজ হয় না। তুমি প্রাণ রাখিতে হুকুম দিয়াছিলে, তাই প্রাণ রাখিয়াছি। দেবী মরিয়াছে; দেবী চৌধুরাণী আর নাই। কিন্তু প্রফুল্ল এখনও আছে। প্রফুল্ল থাকিবে, না দেবীর সঙ্গে যাইবে ?"

ব্রজেশ্বর আদর করিয়া প্রফুল্লের মুখচুম্বন করিল। বলিল, "তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আলো হইবে। তুমি না যাও—আমি যাইব না।"

প্রফুল্ল। আমি ঘরে গেলে আমার শ্বশুর কি বলিবেন ?

ব্র। সে ভার আমার। তুমি উদ্যোগ করিয়া তাঁকে আগে পাঠাইয়া দাও। আমরা পশ্চাৎ যাইব।

প্র। পাল্কী বেহারা আনিতে গিয়াছে।

পাল্কী বেহারা শীঘ্রই আসিল। হরবল্লভও সন্ধ্যাহ্নিক সংক্ষেপে সারিয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, নিশি ঠাকুরাণী ক্ষীর, ছানা, মাখন ও উত্তম সুপক্ক আম্র, কদলী প্রভৃতি ফল তাঁহার জলযোগের জন্য সাজাইতেছে। নিশি অনুনয় বিনয় করিয়া, তাঁহাকে জলযোগে বসাইল। বলিল, "এখন আপনি আমার কুটুম্ব হইলেন; জলযোগ না করিয়া যাইতে পারিবেন না।"

হরবল্লভ জলযোগে না বসিয়া বলিল, "ব্রজেশ্বর কোথায় ? কাল রাত্রে বাহিরে উঠিয়া গেল—আর তাকে দেখি নাই।"

নিশি। তিনি আমার ভগিনীপতি হইবেন—তাঁর জন্য ভাবিবেন না। তিনি এইখানেই আছেন—আপনি জলযোগে বসুন; আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। সেই কথাটা তাঁকে বলিয়া যাউন।

হরবল্লভ জলযোগে বসিল। নিশি ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ভিতরের কামরা হইতে ব্রজেশ্বর বাহির হইল দেখিয়া উভয়ে কিছু অপ্রতিভ হইলেন। হরবল্লভ ভাবিলেন, আমার চাঁদপানা ছেলে দেখে, ডাকিনী বেটীরা ভুলে গিয়েছে। ভালই।

ব্রজেশ্বরকে হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু হে, তুমি যে এখানে কি প্রকারে আসিলে, আমি ত তা এখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। তা যাক্—সে এখনকার কথা নয়, সে কথা পরে হবে। এক্ষণে আমি একটু অনুরোধে পড়েছি—তা অনুরোধটা রাখিতে হইবে। এই ঠাকুরাণীটি সৎকুলীনের মেয়ে—ওঁর বাপ আমাদেরই পালটি—তা ওঁর একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—পাত্র পাওয়া যায় না—কুল যায়। তা কুলীনের কুলরক্ষা কুলীনেরই কাজ—মুটে মজুরের ত কাজ নয়। আর তুমিও পুনর্ব্বার সংসার কর, সেটাও আমার ইচ্ছা বটে, তোমার গর্ভধারিণীরও ইচ্ছা বটে। বিশেষ বড় বউমাটির পরলোকের পর থেকে আমরা কিছু এ বিষয়ে কাতর আছি। তাই বল্‌ছিলাম, যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন এ কর্ত্তব্যই হয়েছে। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এঁর ভগিনীকে বিবাহ কর।"

ব্রজেশ্বর মোটের উপর বলিল, "যে আজ্ঞা।"

নিশির বড় হাসি পাইল, কিন্তু হাসিল না। হরবল্লভ বলিতে লাগিলেন, "তা আমার

পাল্কী বেহারা এসেছে, আমি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করি। তুমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করে বৌ নিয়ে বাড়ী যেও।"

ব্র। যে আজ্ঞা।

হর। তা তোমায় আর বলিব কি, তুমি ছেলেমানুষ নও—কুল, শীল, জাতি, মর্য্যাদা, সব আপনি দেখে শুনে বিবাহ কর্‌বে। (পরে একটু আওয়াজ খাটো করিয়া বলিতে লাগিলেন) আর আমাদের যেটা ন্যায্য পাওনা গণ্ডা, তাও ত জান?

ব্রজ। যে আজ্ঞা।

হরবল্লভ জলযোগ সমাপন করিয়া বিদায় হইলেন। ব্রজ ও নিশি তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি পাল্কীতে চড়িয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুর্গানাম করিয়া প্রাণ পাইলেন। ভাবিলেন, "ছেলেটি ডাকিনী বেটীদের হাতে রহিল—তা ভয় নাই। ছেলে আপনার পথ চিনিয়াছে। চাঁদমুখের সর্ব্বত্র জয়।"

হরবল্লভ চলিয়া গেলে, ব্রজেশ্বর নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি ছল? তোমার ছোট বোন্ কে?"

নিশি। চেন না? তার নাম প্রফুল্ল।

ব্রজ। ও হো! বুঝিয়াছি। কি রকমে এ সম্বন্ধে কর্ত্তাকে রাজি করিলে?

নিশি। মেয়েমানুষের অনেক রকম আছে। ছোট বোনের শাশুড়ী হইতে নাই, নহিলে আরও একটা সম্বন্ধে তাঁকে রাজি করিতে পারিতাম।

দিবা রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি শীগ্‌গির মর। লজ্জা সরম কিছুই নাই? পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি অমন করে কথা কহিতে হয়?"

নিশি। কে আবার পুরুষমানুষ? ব্রজেশ্বর? কাল দেখা গিয়াছে—কে পুরুষ, কে মেয়ে।

ব্র। আজিও দেখিবে। তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত মোটা বুদ্ধির কাজ করিয়াছ। কাজটা ভাল হয় নাই।

নিশি। সে আবার কি?

ব্র। বাপের সঙ্গে কি প্রবঞ্চনা চলে? বাপের চোখে ধূলা দিয়া, মিছে কথা বহাল রাখিয়া, আমি স্ত্রী লইয়া সংসার করিব? যদি বাপকে ঠকাইলাম, তবে পৃথিবীতে কার কাছে জুয়াচুরি করিতে আমার আটকাইবে?

নিশি অপ্রতিভ হইল, মনে মনে স্বীকার করিল, ব্রজেশ্বর পুরুষ বটে। কেবল লাঠি-বাজিতে পুরুষ হয় না, নিশি তা বুঝিল। বলিল, "এখন উপায় ?"

ব্র। উপায় আছে। চল, প্রফুল্লকে লইয়া ঘরে যাই। সেখানে গিয়া বাপকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিব। লুকাচুরি হইবে না।

নিশি। তা হইলে তোমার বাপ কি দেবী চৌধুরাণীকে বাড়ীতে উঠিতে দিবেন ?

দেবী বলিল, "দেবী চৌধুরাণী কে ? দেবী চৌধুরাণী মরিয়াছে, তার নাম এ পৃথিবীতে মুখেও আনিও না। প্রফুল্লের কথা বল।"

নিশি। প্রফুল্লকেই কি তিনি ঘরে স্থান দিবেন ?

ব্র। আমি ত বলিয়াছি যে, সে ভার আমার।

প্রফুল্ল সন্তুষ্ট হইল। বুঝিয়াছিল যে, ব্রজেশ্বরের ভার বহিবার ক্ষমতা না থাকিলে, সে ভার লইবার লোক নহে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তখন ভূতনাথে যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। রঙ্গরাজকে সেইখান হইতে বিদায় দিবার কথা স্থির হইল। কেন না, ব্রজেশ্বরের দ্বারবানেরা এক দিন তাহার লাঠি খাইয়াছিল, যদি দেখিতে পায়, তবে চিনিবে। রঙ্গরাজকে ডাকিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল, কতক নিশি বুঝাইল, কতক প্রফুল্ল নিজে বুঝাইল। রঙ্গরাজ কাঁদিল ;—বলিল, "মা, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন, তা ত কখনও জানিতাম না।" সকলে মিলিয়া রঙ্গরাজকে সান্ত্বনা করিল। দেবীগড়ে প্রফুল্লের ঘর বাড়ী, দেবসেবা, দেবত্র সম্পত্তি ছিল। সে সকল প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে দিলেন, বলিলেন, "সেইখানে গিয়া বাস কর। দেবতার ভোগ হয়, প্রসাদ খাইয়া দিনপাত করিও। আর কখনও লাঠি ধরিও না। তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন। ঠেঙ্গা লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন—তুমি আমি কে ? শিষ্টের পালনের ভার লইও—কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও। এই সকল কথাগুলি আমার পক্ষ হইতে ভবানী ঠাকুরকেও বলিও ; তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও।"

রঙ্গরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইল। দিবা ও নিশি সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের ঘাট পর্য্যন্ত চলিল। সেই বজরায় ফিরিয়া তাহারা দেবীগড়ে গিয়া বাস করিবে, প্রসাদ খাইবে আর

হরিনাম করিবে। বজরায় দেবীর রাণীগিরির আসবাব সব ছিল, পাঠক দেখিয়াছেন। তাহার মূল্য অনেক টাকা। প্রফুল্ল সব দিবা ও নিশিকে দিলেন। বলিলেন, "এ সকল বেচিয়া যাহা হইবে, তাহার মধ্যে তোমাদের যাহা প্রয়োজন, ব্যয় করিবে। বাকী দরিদ্রকে দিবে। এ সকল আমার কিছুই নয়—আমি ইহার কিছুই লইব না।" এই বলিয়া প্রফুল্ল আপনার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারগুলি নিশি ও দিবাকে দিলেন।

নিশি বলিল, "মা! নিরাভরণে শ্বশুরবাড়ী উঠিবে?"

প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকের এই আভরণ সকলের ভাল। আর আভরণে কাজ কি, মা?"

নিশি বলিল, "আজ তুমি প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছ; আমি আজ তোমাকে কিছু যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিব। তুমি মানা করিও না, এই আমার শেষের সাধ—সাধ মিটাইতে দাও।"

এই বলিয়া নিশি কতকগুলি বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে প্রফুল্লকে সাজাইতে লাগিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, নিশি যখন এক রাজমহিষীর কাছে থাকিত, রাজমহিষী তাহাকে অনেক অলঙ্কার দিয়াছিলেন। এ সেই গহনা। দেবী তাহাকে নূতন গহনা দিয়াছিলেন বলিয়া সেগুলি নিশি পরিত না। এক্ষণে দেবীকে নিরাভরণা দেখিয়া সেইগুলি পরাইল। তার পর আর কোন কাজ নাই, কাজেই তিন জনে কাঁদিতে বসিল। নিশি গহনা পরাইবার সময়েই সুর তুলিয়াছিল; দিবা তৎক্ষণাৎ পোঁ॰ ধরিলেন। তার পর পোঁ সানাই ছাপাইয়া উঠিল। প্রফুল্লও কাঁদিল—না কাঁদিবার কথা কি? তিন জনের আন্তরিক ভালবাসা ছিল; কিন্তু প্রফুল্লের মন আহ্লাদে ভরা, কাজেই প্রফুল্ল অনেক নরম গেল। নিশিও দেখিল যে, প্রফুল্লের মন সুখে ভরা; নিশিও সে সুখে সুখী হইল, কান্নায় সেও একটু নরম গেল। সে বিষয়ে যাহার যে ত্রুটি হইল, দিবা ঠাকুরাণী তাহা সারিয়া লইলেন।

যথাকালে বজরা ভূতনাথের ঘাটে পৌঁছিল। সেইখানে দিবা ও নিশির পায়ের ধূলা লইয়া, প্রফুল্ল তাহাদিগের কাছে বিদায় লইল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বজরায় ফিরিয়া যথাকালে দেবীগড়ে পৌঁছিল। দাঁড়ি মাঝি বরকন্দাজের বেতন হিসাব করিয়া দিয়া, তাহাদের জবাব দিল। বজরাখানি রাখা অকর্ত্তব্য—চেনা বজরা। প্রফুল্ল বলিয়া দিয়াছিল, "উহা রাখিও না।" নিশি বজরাখানাকে চেলা করিয়া দুই বৎসর ধরিয়া পোড়াইল।

এই চেলা কাঠের উপঢৌকন দিয়া পাঠক মহাশয় নিশি ঠাকুরাণীর কাছে বিদায় লউন। অনুপযুক্ত হইবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভূতনাথের ঘাটে প্রফুল্লের বজরা ভিড়িবামাত্র, কে জানে কোথা দিয়া, গ্রামময় রাষ্ট্র হইল যে, ব্রজেশ্বর আবার একটা বিয়ে করে এনেছে; বড় না কি খেড়ে বৌ। সুতরাং ছেলে বুড়ো, কাণা খোঁড়া যে যেখানে ছিল, সব বৌ দেখিতে ছুটিল। যে রাঁধিতেছিল, সে হাঁড়ি ফেলিয়া ছুটিল; যে মাছ কুটিতেছিল, সে মাছে চুপড়ি চাপা দিয়া ছুটিল; যে স্নান করিতেছিল, সে ভিজে কাপড়ে ছুটিল। যে খাইতে বসিয়াছিল, তার আধপেটা বৈ খাওয়া হইল না। যে কোন্দল করিতেছিল, শত্রুপক্ষের সঙ্গে হঠাৎ তার মিল হইয়া গেল। যে মাগী ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিল, তার ছেলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল, মার কোলে উঠিয়া খেড়ে বৌ দেখিতে চলিল। কাহারও স্বামী আহারে বসিয়াছেন, পাতে ডাল তরকারী পড়িয়াছে, মাছের ঝোল পড়ে নাই, এমন সময়ে বৌয়ের খবর আসিল, আর তাঁর কপালে সেদিন মাছের ঝোল হইল না। এইমাত্র বুড়ী নাতিনীর সঙ্গে কাজিয়া করিতেছিল যে, "আমার হাত ধরিয়া না নিয়ে গেলে, আমি কেমন করে পুকুরঘাটে যাই ?" এমন সময়ে গোল হইল—বৌ এসেছে, অমনি নাতিনী আয়ি ফেলিয়া বৌ দেখিতে গেল, আয়িও কোন রকমে সেইখানে উপস্থিত। এক যুবতী মার কাছে তিরস্কার খাইয়া শপথ করিতেছিলেন যে, তিনি কখন বাহির হন না, এমন সময়ে বৌ আসার সংবাদ পৌছিল, শপথটা সম্পূর্ণ হইল না; যুবতী বৌয়ের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। মা শিশু ফেলিয়া ছুটিল, শিশু মার পিছু পিছু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল। ভাশুর, স্বামী বসিয়া আছে, ভ্রাতৃবধূ মানিল না, ঘোমটা টানিয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ছুটিতে যুবতীদের কাপড় খসিয়া পড়ে, আঁটিয়া পরিবার অবকাশ নাই। চুল খুলিয়া পড়ে, জড়াইবার অবকাশ নাই। সামলাইতে কোথাকার কাপড় কোথায় টানেন, তারও বড় ঠিক নাই। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লজ্জায় লজ্জাদেবী পলায়ন করিলেন।

বর-কন্যা আসিয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াছে, গিন্নী বরণ করিতেছেন। বৌয়ের মুখ দেখিবার জন্য লোকে ঝুঁকিয়াছে, কিন্তু বৌ বৌগিরির চাল ছাড়ে না, দেড় হাত ঘোমটা টানিয়া রাখিয়াছে, কেহ মুখ দেখিতে পায় না। শাশুড়ী বরণ করিবার সময়ে একবার ঘোমটা খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন। একটু চমকিয়া উঠিলেন, আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "বেস্ বউ।" তাঁর চোখে একটু জল আসিল।

বরণ হইয়া গেলে, বধূ ঘরে তুলিয়া শাশুড়ী সমবেত প্রতিবাসিনীদিগকে বলিলেন, "মা ! আমার বেটা বউ অনেক দূর থেকে আসিতেছে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। আমি এখন ওদের

খাওয়াই দাওয়াই। ঘরের বউ ত ঘরেই রহিল, তোমরা নিত্য দেখ্বে; এখন ঘরে যাও, খাও দাও গিয়া।"

গিন্নীর এই বাক্যে অপ্রসন্ন হইয়া নিন্দা করিতে করিতে প্রতিবাসিনীরা ঘরে গেল। দোষ গিন্নীর, কিন্তু নিন্দাটা বধূরই অধিক হইল; কেন না, বড় কেহ মুখ দেখিতে পায় নাই। খেড়ে মেয়ে বলিয়া সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিল। আবার সকলেই বলিল, "কুলীনের ঘরে অমন ঢের হয়।" তখন যে যেখানে কুলীনের ঘরে বুড় বৌ দেখিয়াছে, তার গল্প করিতে লাগিল। গোবিন্দ মুখুয্যা পঞ্চান্ন বৎসরের একটা মেয়ে বিয়ে করিয়াছিল, হরি চাটুয্যা সত্তর বৎসরের এক কুমারী ঘরে আনিয়াছিলেন, মনু বাঁড়ুয্যা একটি প্রাচীনার অন্তর্জ্জলে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সকল আখ্যায়িকা সালঙ্কারে পথিমধ্যে ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। এইরূপ আন্দোলন করিয়া ক্রমে গ্রাম ঠাণ্ডা হইল।

গোলমাল মিটিয়া গেল; গিন্নী বিরলে ব্রজেশ্বরকে ডাকিলেন। ব্রজ আসিয়া বলিল, "কি মা?"

গিন্নী। বাবা, এ বৌ কোথা পেলে, বাবা?

ব্রজ। এ নূতন বিয়ে নয়, মা!

গিন্নী। বাবা, এ হারাধন আবার কোথায় পেলে, বাবা?

গিন্নীর চোখে জল পড়িতেছিল।

ব্রজ। মা, বিধাতা দয়া করিয়া আবার দিয়াছেন। এখন মা, তুমি বাবাকে কিছু বলিও না। নির্জ্জনে পাইলে আমি সকলই তাঁর সাক্ষাতে প্রকাশ করিব।

গিন্নী। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, বাপ, আমিই সব বলিব। বৌভাতটা হইয়া যাক্। তুমি কিছু ভাবিও না। এখন কাহারও কাছে কিছু বলিও না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। এ কঠিন কাজের ভার মা লইলেন। ব্রজ বাঁচিল। কাহাকে কিছু বলিল না।

পাকস্পর্শ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। বড় ঘটা পটা কিছু হইল না, কেবল জনকতক আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া হরবল্লভ কার্য্য সমাধা করিলেন।

পাকস্পর্শের পর গিন্নী আসল কথাটা হরবল্লভকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। বলিলেন যে, "এ নূতন বিয়ে নয়—সেই বড় বউ।"

হরবল্লভ চমকিয়া উঠিল—সুপ্ত ব্যাঘ্রকে কে যেন বাণে বিঁধিল। "অ্যাঁ, সেই বড় বউ—কে বল্লে?"

গিন্নী। আমি চিনেছি। আর ব্রজও আমাকে বলিয়াছে।

হর। সে যে দশ বৎসর হলো ম'রে গেছে।

গিন্নী। মরা মানুষেও কখন ফিরে থাকে ?

হর। এত দিন সে মেয়ে কোথায় কার কাছে ছিল ?

গিন্নী। তা আমি ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসাও করিব না। ব্রজ যখন ঘরে আনিয়াছে, তখন না বুঝিয়া সুঝিয়া আনে নাই।

হর। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। তুমি একবার কথা কহিয়াছিলে, তার ফলে আমার ছেলে আমি হারাইতে বসিয়াছিলাম। আমার একটি ছেলে। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। যদি তুমি কোন কথা কহিবে, তবে আমি গলায় দড়ি দিব।

হরবল্লভ এতটুকু হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। কেবল বলিলেন, "তবে লোকের কাছে নূতন বিয়ের কথাটাই প্রচার থাক্।"

গিন্নী বলিলেন, "তাই থাকিবে।"

সময়ান্তরে গিন্নী ব্রজেশ্বরকে সুসংবাদ জানাইলেন। বলিলেন, "আমি তাঁকে বলিয়া-ছিলাম। তিনি কোন কথা কহিবেন না। সে সব কথার আর কোন উচ্চবাচ্যে কাজ নাই।"

ব্রজ হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্লকে খবর দিল।

আমরা স্বীকার করি, গিন্নী এবার বড় গিন্নীপনা করিয়াছেন। যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি ?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল সাগরকে দেখিতে চাহিল। ব্রজেশ্বরের ইঙ্গিত পাইয়া গিন্নী সাগরকে আনিতে পাঠাইলেন। গিন্নীরও সাধ, তিনটি বৌ একত্র করেন।

যে লোক সাগরকে আনিতে গিয়াছিল, তাহার মুখে সাগর শুনিল, স্বামী আর একটা বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন—বুড়ো মেয়ে। সাগরের বড় ঘৃণা হইল। "ছি! বুড়ো মেয়ে!" বড় রাগ হইল, "আবার বিয়ে ?—আমরা কি স্ত্রী নই ?" দুঃখ হইল, "হায়! বিধাতা কেন

আমায় দুঃখীর মেয়ে করেন নাই—আমি কাছে থাকিতে পারিলে, তিনি হয় ত আর বিয়ে করিতেন না।"

এইরূপ রুষ্ট ও ক্ষুণ্ণভাবে সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিল। আসিয়াই প্রথমে নয়ান বৌয়ের কাছে গেল। নয়ান বৌ, সাগরের দুই চক্ষের বিষ; সাগর বৌ, নয়ানেরও তাই। কিন্তু আজ দুই জন এক, দুই জনের এক বিপদ্। তাই ভাবিয়া সাগর আগে নয়নতারার কাছে গেল।

সাপকে হাঁড়ির ভিতর পুরিলে, সে যেমন গর্জ্জিতে থাকে, প্রফুল্ল আসা অবধি নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল। একবার মাত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—গালির চোটে ব্রজেশ্বর পলাইল, আর আসিল না। প্রফুল্লও ভাব করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তারও সেই দশা ঘটিল। স্বামী সপত্নী দূরে থাক্, পাড়াপ্রতিবাসীও সে কয় দিন নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। নয়নতারার কতকগুলি ছেলে মেয়ে হইয়াছিল। তাদেরই বিপদ্ বেশী। এ কয় দিন মার খাইতে খাইতে তাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

সেই দেবীর শ্রীমন্দিরে প্রথম সাগর গিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া নয়নতারা বলিল, "এসো, এসো! তুমি বাকী থাক কেন? আর ভাগীদার কেউ আছে?"

সাগর। কি! আবার না কি বিয়ে করেছে?

নয়ন। কে জানে, বিয়ে কি নিকে, তার খবর আমি কি জানি?

সাগর। বামনের মেয়ের কি আবার নিকে হয়?

নয়ন। বামন, কি শূদ্র, কি মুসলমান, তা কি আমি দেখ্‌তে গেছি?

সাগর। অমন কথাগুলো মুখে এনো না। আপনার জাত বাঁচিয়ে সবাই কথা কয়।

নয়ন। যার ঘরে অত বড় কনে বৌ এলো, তার আবার জাত কি?

সাগর। কত বড় মেয়ে? আমাদের বয়স হবে?

নয়ন। তোর মার বয়সী।

সাগর। চুল পেকেছে?

নয়ন। চুল না পাক্‌লে আর রাত্রি দিন বুড়ো মাগী ঘোম্‌টা টেনে বেড়ায়?

সা। দাঁত পড়েছে?

ন। চুল পাক্‌লো, দাঁত আর পড়ে নি?

সা। তবে স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় বল?

ন। তবে শুন্‌চিস্ কি?

সা। তাও কি হয়?

ন। কুলীনের ঘরে এ সব হয়।

সা। দেখতে কেমন ?

ন। রূপের ধ্বজা! যেন গালফুলো গোবিন্দের মা।

সা। যে বিয়ে ক'রেছে, তাকে কিছু বল নি ?

ন। দেখ্‌তে পাই কি ? দেখ্‌তে পেলে হয়। মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি।

সা। আমি তবে সে সোনার প্রতিমাখানা দেখে আসি।

ন। যা, জন্ম সার্থক কর্‌গে, যা।

নূতন সপত্নীকে খুঁজিয়া, সাগর তাহাকে পুকুর-ঘাটে ধরিল। প্রফুল্ল পিছন ফিরিয়া বাসন মাজিতেছিল। সাগর পিছনে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তুমি আমাদের নূতন বৌ ?"

"কে, সাগর এয়েছ ?" বলিয়া নূতন বৌ সমুখ ফিরিল।

সাগর দেখিল, কে। বিস্ময়াপন্না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী রাণী ?"

প্রফুল্ল বলিল, "চুপ্‌! দেবী মরিয়া গিয়াছে।"

সা। প্রফুল্ল ?

প্র। প্রফুল্লও মরিয়াছে।

সা। কে তবে তুমি ?

প্র। আমি নূতন বৌ।

সা। কেমন ক'রে কি হলো, আমায় সব বল দেখি।

প্র। এখানে বলিবার জায়গা নয়। আমি একটি ঘর পাইয়াছি, সেইখানে চল, সব বলিব।

দুই জনে দ্বার বন্ধ করিয়া, বিরলে বসিয়া, কথোপকথন হইল। প্রফুল্ল সাগরকে সব বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে ? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে ? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে ? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা, পারির মার হুকুম-বরদারি কি তার ভাল লাগিবে ?"

প্র। ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়।

ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।

সা। তবে কিছু দিন আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার চেলা হইব।

যখন সাগরের সঙ্গে প্রফুল্লের এই কথা হইতেছিল, তখন ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে ব্রজেশ্বর ভোজনে বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেজ, এখন কেমন রাঁধি?"

ব্রজেশ্বরের সেই দশ বছরের কথা মনে পড়িল। কথাগুলি মূল্যবান্—তাই দুই জনেরই মনে ছিল।

ব্রজ বলিল, "বেস্।"

ব্রহ্ম। এখন গোরুর দুধ কেমন? বেগড়ায় কি?

ব্রজ। বেস্ দুধ।

ব্রহ্ম। কই, দশ বৎসর হলো—আমায় ত গঙ্গায় দিলি না?

ব্রজ। ভুলে গিছিলেম।

ব্রহ্ম। তুই আমায় গঙ্গায় দিস্ নে। তুই বাগ্দী হয়েছিস্।

ব্রজ। ঠান্দিদি! চুপ্। ও কথা না।

ব্রহ্ম। তা দিস্, পারিস্ ত গঙ্গায় দিস্। আমি আর কথা কব না। কিন্তু ভাই, কেউ যেন আমার চর্‌কা টর্‌কা ভাঙ্গে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল। শাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষ প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সে কাজ তাঁর ভাল লাগিত না। শ্বশুর শাশুড়ী প্রফুল্লকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করিত না, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার উপর তাহাদের এতটাই শ্রদ্ধা হইল। ব্রহ্মঠাকুরাণীও রান্নাঘরের কর্ত্তৃত্ব প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিলেন। বুড়ী আর বড় রাঁধিতে পারে না, তিন বৌ রাঁধে; কিন্তু যেদিন প্রফুল্ল দুই একখানা না রাঁধিত, সেদিন কাহারও অন্ন ব্যঞ্জন ভাল লাগিত না। যাহার ভোজনের কাছে প্রফুল্ল না দাঁড়াইত, সে মনে করিত, আধপেটা খাইলাম। শেষ নয়ান বৌও বশীভূত হইল। আর প্রফুল্লের সঙ্গে

কোন্দল করিতে আসিত না। বরং প্রফুল্লের ভয়ে আর কাহারও সঙ্গে কোন্দল করিতে সাহস করিত না। প্রফুল্লের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ করিত না। দেখিল, নয়নতারার ছেলেগুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সাগর বাপের বাড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিল না—আবার আসিল। প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।

এ সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোনা হইত। প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র—সংসার-গ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। অথচ কেহই হরবল্লভের গৃহে জানিতে পারিল না যে, প্রফুল্ল এমন শাণিত অস্ত্র। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত—সে কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর-পরিচয়ও আছে। গৃহধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়। যেখানে বিদ্যা প্রকাশের স্থান নহে, সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সেই মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।

প্রফুল্লের যাহা কিছু বিবাদ, সে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে। প্রফুল্ল বলিত, "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ-দখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতি দেবতা; তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায় না কেন?" ব্রজেশ্বর তা শুনিত না। ব্রজেশ্বরের হৃদয় কেবল প্রফুল্লময়। প্রফুল্ল বলিত, "আমায় যেমন ভালবাস, উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি।" ব্রজেশ্বর তা বুঝিত না।

প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সদ্বিবেচনার গুণে, সংসারের বিষয়কর্ম্মও তাহার হাতে আসিল। তালুক মুলুকের কাজ বাহিরে হইত বটে, কিন্তু একটু কিছু বিবেচনার কথা উঠিলে, কর্ত্তা আসিয়া গিন্নীকে বলিতেন, "নূতন বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তিনি কি বলেন?" প্রফুল্লের পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া, দিন দিন লক্ষ্মী-শ্রী বাড়িতে লাগিল। শেষ যথাকালে ধন জন ও সর্ব্বসুখে পরিবৃত হইয়া হরবল্লভ পরলোকে গমন করিলেন।

বিষয় ব্রজেশ্বরের হইল। প্রফুল্লের গুণে ব্রজেশ্বরের নূতন তালুক মুলুক হইয়া হাতে অনেক নগদ টাকা জমিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমার সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ শোধ কর।"

ব্র। কেন, তুমি টাকা লইয়া কি করিবে?

প্র। আমি কিছু করিব না। কিন্তু টাকা আমার নয় শ্রীকৃষ্ণের;—কাঙ্গাল গরিবের। কাঙ্গাল গরিবকে দিতে হইবে।

ব্র। কি প্রকারে?

প্র। পঞ্চাশ হাজার টাকায় এক অতিথিশালা কর।

ব্রজেশ্বর তাই করিল। অতিথিশালা মধ্যে এক অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, অতিথিশালার নাম দিল, "দেবীনিবাস।"

যথাকালে পুত্র-পৌত্রে সমাবৃত হইয়া, প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। দেশের লোক সকলেই বলিল, "আমরা মাতৃহীন হইলাম।"

রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি, দেবীগড়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদভোজনে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া, পরলোকে গমন করিলেন। ভবানী ঠাকুরের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিল না।

ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।

তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, "আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।" এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।" ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।

এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন।" আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

'দেবী চৌধুরাণী'র বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ

'দেবী চৌধুরাণী' 'বঙ্গদর্শনে'র ৯৯ সংখ্যায় (পৌষ, ১২৮৯) সুরু হইয়া ১০৬ সংখ্যা (মাঘ, ১২৯০) পর্য্যন্ত অংশতঃ প্রকাশিত হয়। ১০৬ সংখ্যার পর বঙ্কিম-যুগের 'বঙ্গদর্শন' আর বাহির হয় নাই বলিয়া 'দেবী চৌধুরাণী'ও অসমাপ্ত রহিয়া যায়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম খণ্ড সপ্তদশ পরিচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় খণ্ড দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, মে) সম্পূর্ণ গ্রন্থ একেবারে পুস্তকাকারে বাহির করেন। ইহা "৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত" ও "শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত" হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তক মোট তিন খণ্ডে (১৬+১২+১৪) বিয়াল্লিশ পরিচ্ছেদে ২০৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয়। নিতান্ত পরিণত বয়সের রচনা হওয়া সত্ত্বেও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত অংশ পুস্তকাকারে যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের নিত্যপরিবর্ত্তনপ্রয়াসী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডের নবম হইতে সপ্তদশ, এই নয় পরিচ্ছেদকে তিনি যে শুধু ভাঙ্গিয়া আট পরিচ্ছেদেই শেষ করিয়াছেন, তাহা নয়, আগাগোড়া একেবারে ঢালিয়া সাজিয়াছেন। সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ আমাদের আলোচনার বিষয় নহে বলিয়া এই সকল বিচিত্র পরিবর্ত্তন প্রদর্শিত হইল না।

বঙ্কিমের জীবিতকালে 'দেবী চৌধুরাণী'র ছয়টি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল ; পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পর বঙ্কিমচন্দ্র ইহার খুব বেশী পরিবর্ত্তন করেন নাই। দ্বিতীয় সংস্করণ (১২৯১, পৃ. ২০৬) প্রথম সংস্করণের হুবহু অনুরূপ। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি প্রকাশিত হইয়াছিল, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৩। চতুর্থ সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই বাহির হইয়াছিল, আমরা এই সংস্করণ একখানিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পঞ্চম (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) ও ষষ্ঠ (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ) সংস্করণ অনেকটা এক, দুইটিই ২৩১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন যাহা লক্ষিত হয়, তাহা ষষ্ঠ অর্থাৎ শেষ সংস্করণে সাধিত হইয়াছে—দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে (পৃ. ৯৫ দ্রষ্টব্য) যে দুইটি অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে, পঞ্চম সংস্করণ পর্য্যন্ত তাহা বরাবরই ছিল। প্রথম সংস্করণের "ডাকাত" ষষ্ঠ সংস্করণের প্রায় সর্ব্বত্র "ডাকাইত" হইয়াছে।

প্রথম ও ষষ্ঠ সংস্করণের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।—

পৃ.	পংক্তি	ষষ্ঠ সংস্করণ	প্রথম সংস্করণ
১৪	১৪-১৭	—থাকি, যদি—…কিসে হবে ভাই ?	সা। একবার দেখা করবে না ? প্র। কার সঙ্গে ? তোমার সঙ্গে ? সা। দূর! যেন হাবি। শ্বশুরবাড়ী এসে কি কেবল সতীনের সঙ্গে দেখা করতে হয়, আর কার সঙ্গে যেন দেখা করতে হয় না।
১৪	১৮-২০	চক্ষে জল পড়িল।…নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি	বলিল, "বুঝি নাই ভাই—স্বামীর সঙ্গে ? তা কি কপালে ঘটিবে ?" সা। আমি ঘটাইব। তুমি
৩৬	২	মাতাপিতার	বংশাবলীর
৪৩	২৭	* Warren Hastings.	*
৪৮	১১-১৭	যে রাত্রে দুর্লভ চক্রবর্ত্তী…জিজ্ঞাসা করেন।	———
৪৮	১৮	ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে	সে রাত্রে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে
৫৫	১৭	করিবে।	করিবে। কোন কর্ম্মের শুভ ফল নিজে প্রাপ্ত হইবার কামনা করিবে না।
৬৩	২৪	দুই আঙ্গুল	চারি আঙ্গুল
৬৪	১৯	সুগন্ধি-চূর্ণ-গন্ধে	সুগন্ধি তৈলের গন্ধে
৬৫	২৩	উড়াইয়া যাও।	উড়াইয়া যাও। পিছন হইতে।
৭১	৩	রঙ্গ। সব মঙ্গল।	রঙ্গ। সব মঙ্গল। দেবী। তোমাদের কেহ মারা পড়িয়াছে ? রঙ্গ। না।
৮৮	১৮	ডাকাত! ছি!	ডাকাত! ছি! আমি মরিলাম না কেন ? প্রফুল্ল মরিল না কেন ?
৯৪	২৪	পদবন্দনা করিলেন।	পদবন্দনা করিলেন। ব্রজেশ্বর মনে মনে স্থির সংকল্প করিয়াছিলেন যে, এ ডাকাইতির টাকা স্পর্শ করা যাইবে না—"তাহা হইলে আমরা সেই পাপীয়সীর"—হায় প্রফুল্ল এখন পাপীয়সী!—"পাপীয়সীর পাপের ভাগী হইব।" কিন্তু ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিই সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণ হইল।
৯৫	২	"তবে টাকা পাও নাই ?"	"তবে টাকা পাও নাই ?" ব্রজেশ্বর যদি বলেন যে, "টাকা পাই নাই" তবে স্পষ্ট মিথ্যা কথা হয়। ব্রজেশ্বর যদি এ কালের ছেলে হইতেন,

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ষষ্ঠ সংস্করণ	প্রথম সংস্করণ

তবে ইংরেজি পড়িয়া "Lie direct" সম্বন্ধে এ স্থলে কি বিবেচনা করিতেন, বলিতে পারি না, কিন্তু ব্রজেশ্বর সে কেলে ছেলে—একটা "Lie direct" সম্বন্ধে অবস্থাবিশেষে তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আর যেখানে ব্রজেশ্বর মিথ্যা কথা বলিতে পারুক আর না পারুক, বাপের সম্মুখে নহে। মুখ দিয়া কখনও বাহির হয় নাই। ব্রজেশ্বর বলিতে পারিল না, টাকা পাই নাই। ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া হরবল্লভ হতাশ্বাস হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, চুপ করিয়া থাকাও মিথ্যাবাদ হইতেছে। ব্রজেশ্বর টাকা আনিয়াছেন, অথচ তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া হরবল্লভ বুঝিতেছেন যে, ব্রজ টাকা আনে নাই। ব্রজেশ্বরের মোটা বুদ্ধিতে বোধ হইল যে, আমি বাপকে প্রবঞ্চনা করিতেছি। আমার মার্জ্জিতবুদ্ধি, মার্জ্জিতরুচি, মার্জ্জিতপাদুক একেলে ইংরেজিনবিসের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধ হইত যে, "আমি ত মিছে কিছুই বলি নাই—যেটুকু বলিয়াছি, সাঁচা সত্য। তবে দেবী চৌধুরাণীর টাকার কথা আমি বলিতে বাধ্য নই—কেন না, সে টাকা ত আনিবার কোন কথাও ছিল না, আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও হয় নাই। আর সে ডাকাতির টাকা—গ্রহণ করিলে পিতৃঠাকুর মহাশয় পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবেন, অতএব সে কথা প্রকাশ না করাই আমার ন্যায় বিশুদ্ধাত্মার কাজ। বিশেষ, আমার মুখ দিয়া ত মিথ্যা বাহির হয় নাই—তা বাবা কেন জেলে যান না—আমি কি করব?" ব্রজেশ্বর তত বিশুদ্ধাত্মা নয়—সে সে রকম ভাবিল না। তার বাপ মাথায় হাত দিয়া নীরব হইয়া বসিয়াছে—দেখিয়া তার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ব্রজেশ্বর আর থাকিতে পারিলেন না—বলিয়া ফেলিলেন,

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ষষ্ঠ সংস্করণ	প্রথম সংস্করণ
১২০	১৯	"আমার ইহাতে কথা কহা	আমি অতি ক্ষুদ্র চাকরাণী। আমার ইহাতে কথা কহা
১২০	২০	ব্যক্তিকে নিশান দিতেছে।"	ব্যক্তিকে নিশান দিতেছে। পরে দিবাকে দেখাইয়া বলিল, "এই যথার্থ রাণীজি!"

পৃ.	পংক্তি	ষষ্ঠ সংস্করণ	প্রথম সংস্করণ
১২০	২১-২২	তখন সাহেব…দেবী।"	এই স্থলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, দেবীর এই উক্তি, আধুনিক পাশ্চাত্য ধর্ম্মনীতি শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে গেলে গর্হিত বলিতে হয়। কেন না, কথাটা মিছা কথা। ইহা পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য কার্য্য-প্রণালীর অনুমোদিত কি না, তাহা পাঠক বিবেচনা করুন। তবে দেবীর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তার সত্যবাদের ভান নাই। ভানই ভয়ানক মিথ্যাবাদিতা। সরল নীতিশাস্ত্র ও জটিল কর্ম্মকৌশলের একত্র সমাবেশ হইতে জগদীশ্বর মানবজাতিকে রক্ষা করুন।
১২০	২৫	দেবী বলে, "আমি দেবী।"	দেবী দিবাকে বলে, "এই দেবী।"
১২০	২৭-২৮	ওটা চাকরাণী, ওটা দেবী নহে।	——
১৩১	৬	লজ্জায়	সীতা দেবীর উদ্দেশে